একজন দুর্বল মানুষ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

একজন দুর্বল মানুষ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সময় প্রকাশন

দ্বিতীয় মুদ্রণ
১ লা জানুয়ারি' ৯৭
সময় প্রথম প্রকাশ
১লা জানুয়ারী '৯৫ (ঢাকা বইমেলা'৯৫)
© লেখক
সময়
সময় ৮৭
প্রকাশক ॥ ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা
প্রচ্ছদ ॥ ধ্রুব এষ
কম্পোজ ॥ কেয়া কম্পিউটার্স
৪৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ॥ সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার ঢাকা
মূল্য ॥ পঞ্চাশ টাকা
ISBN 984-458-087-0

উৎসর্গ

আয়েশা ফয়েজ
আমার জন্মদাত্রী মাতা
যিনি একাত্তুরে আমাদের দ্বিতীয়বার জন্ম দিয়েছেন।

ভূমিকা

আমার এই বইয়ের পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠিকা ছিলেন মিসেস জাহানারা ইমাম। পাণ্ডুলিপিটি পড়ে বইয়ের পিছনে ব্যবহার করার জন্য তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্র কিছু কথা লিখে দিয়েছিলেন। এই সংস্করণে তার সেই কথাগুলি বইয়ের পিছনে জুড়ে দিতে গিয়ে আমার বারবার তাঁর কথা মনে পড়েছে।

এই বইয়ের তৃতীয় গল্পটি-"ইরা নামের হরিণ" আত্মজৈবনিক। ছোট গল্প সংকলনে কেন একটি সত্যি ঘটনা জুড়ে দিয়েছি আমি নিজেও ভাল করে জানি না।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৪
পল্লবী, ঢাকা

একজন দুর্বল মানুষ

বিকট একটা চিৎকার দিয়ে আমি উঠে বসলাম, বুকের ভেতর ঢাকের মত শব্দ হচ্ছে, সারা শরীর ঘামে ভেজা, গলা শুকিয়ে কাঠ। কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝতে আমি কোথায়— নিজের ঘরে বিছানার উপর বসে আছি জানার পরও আমার শরীর কাঁপতে থাকে। মাথার কাছে গ্লাসে পানি রাখা থাকে, হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দিলাম। খানিকক্ষণ লাগল আমার ধাতস্থ হতে। আবছা অন্ধকার চারদিকে, ভোর হতে এখনো বেশ দেরি আছে। আমি বিছানায় হাঁটু ভাঁজ করে বসে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে থাকি। ইশ—কী একটা স্বপ্ন!

এই একটা নতুন ঝামেলা শুরু হয়েছে— প্রায় প্রতি রাতেই একই ব্যাপার, ঘুরে ফিরে এই একই স্বপ্ন। আমি টেবিলের উপর হাত বিছিয়ে বসে আছি, আর একটা ন্যাটো মানুষ— তার সারা শরীর লোম দিয়ে ঢাকা, একটা হাতুড়ি নিয়ে চিৎকার করে আমার হাতের আঙুলগুলো একটা একটা করে থেঁতলে দিচ্ছে, প্রচণ্ড আঘাতে আমার আঙুল থেকে নখ ছিটকে বের হয়ে আসছে আর আমি চেঁচাচ্ছি। কি ভয়ানক ব্যাপার! কেন আমি এরকম একটা জিনিস দেখছি? মিলিটারি আমাকে ধরে নিয়ে দুই মাস আটকে রেখেছিল সত্যি কিন্তু আমার উপর সে রকম কোন অত্যাচার তো করেনি। দেশ স্বাধীন হবার পর গলায় ফুলের মালা দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করে আনা হল আমাদের। গলা কাঁপিয়ে আমি একটা ছোটখাট বক্তৃতাও দিয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু এখন একি ব্যাপার? যত দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হচ্ছে অবস্থা, আগে মাসে এক-দুই দিন দেখতাম স্বপ্নটা, তারপর সপ্তাহে এক-দুই দিন আজকাল প্রায় প্রতি রাতেই দেখি। এমন অবস্থা হয়েছে যে ইদানিং তো ঘুমোতে যেতেই ভয় করে।

বালিশের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরালাম,

মাত্র দুটি সিগারেট রয়েছে, রাতে নতুন একটা প্যাকেট খুলেছি এর মাঝেই সবশেষ। এত সিগারেট খেলে তো এমনিতেই যক্ষ্মা টক্ষ্মা কিছু একটা হয়ে যাবে।

সিগারেটে দুটি টান দিয়ে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হল। স্বপ্ন তো স্বপ্নই, এটা নিয়ে মাথা গরম করে কি হবে? বেঁচে ফিরে এসেছি সেটাই বড় কথা, সেটা নিয়েই তো খুশি থাকা উচিত। কয়জন আর মিলিটারির হাত থেকে অ্যাস্ত ফিরে এসেছে?

সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে ধরে আমি বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম, আজ মনে হয় আর ঘুম আসবে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই মনটা ভাল হয়ে গেল, ভোরের প্রথম আলোতে সবকিছু এত সুন্দর দেখায় কেন? বাইরের এই হতশ্রী জায়গাটাও এখন কি মায়াময় লাগছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে পড়ল আজ এপ্রিলের চার তারিখ, আমার মায়ের মৃত্যু দিবস। প্রথম মৃত্যু দিবস। কি আশ্চর্য দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল?

আজকাল মারা যাওয়ার ব্যাপারটি কেমন জানি সহজ হয়ে গেছে। যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন মায়ের একবার অসুখ হয়েছিল, খারাপ রকমের নিমোনিয়া। কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম, মনে হত যদি মরে যান তখন কি হবে? ভয়ের চোটে একবারে সত্যি সত্যি পেট নেমে গিয়েছিল আমার। মা যখন সত্যি সত্যি মারা গেলেন তখন কিন্তু ঠিক করে কেমন জানি সব কিছু বুঝতে পারলাম না, দুঃখ টুঃখ বেশি হল না, মনে হল এরকমই তো হবে। তখন অবিশ্যি একটা ঘোরের মাঝে ছিলাম, মিলিটারির ভয়ে আতংকে দিশেহারা হয়ে দুদিন থেকে হাঁটছি, মা'র জ্বর, ভাল হাঁটতে পারেন না, ধরে ধরে কোনভাবে নিয়ে যাই। বিকেলের দিকে রাস্তার পাশে বসে বমি করলেন, সন্ধের দিকে বললেন, আমি আর পারি না, তোরা যা। শুনে দুঃখ নয়, হতাশা নয়, সবাই কেমন জানি মায়ের উপর রেগে উঠল। একবছর পর এখন সেই ঘটনা মনে পড়ে আমার এত লজ্জা লাগতে লাগল যে বলার নয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষদের শুয়োরের বাচ্চা মিলিটারিরা কী রকম হৃদয়হীন অমানুষ করে দিয়েছিল!

মা মারা গেলেন এপ্রিলের চার তারিখ, রোববার। তারিখটা বের করেছিলাম পরে, তখন দিন তারিখের কথা মনে ছিল না। একটা অচেনা গ্রামে অপরিচিত একজন মানুষের বাড়ির বারান্দায় শুয়ে আমার মা, যিনি সেই যুগে বাংলায় এম.এ. পাশ করেছিলেন চুপচাপ মারা গেলেন। মোটামুটি যান্ত্রিক দক্ষতায় তাকে একটা পুকুর পাড়ে কবর দেয়া হয়েছিল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমার পুরো ঘটনাটি মনে পড়ে গেল, আর কেন জানি বেশ একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। আঁখু যে গোহ ছবিতে এরকম একটা সিনেমার নায়ক ঠিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

আজকে ভাল একটা কিছু করতে হবে মায়ের জন্য। মোটামুটি দুর্বল চরিত্রের মানুষ আমি, ভাল কিংবা খারাপ কোনকিছুই করতে পারি না। তবুও আমার এম.এ.পাশ মায়ের

একজন দুর্বল মানুষ

বিকট একটা চিৎকার দিয়ে আমি উঠে বসলাম, বুকের ভেতর ঢাকের মত শব্দ হচ্ছে, সারা শরীর ঘামে ভেজা, গলা শুকিয়ে কাঠ। কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝতে আমি কোথায়— নিজের ঘরে বিছানার উপর বসে আছি জানার পরও আমার শরীর কাঁপতে থাকে। মাথার কাছে গ্লাসে পানি রাখা থাকে, হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দিলাম। খানিকক্ষণ লাগল আমার ধাতস্থ হতে। আবছা অন্ধকার চারদিকে, ভোর হতে এখনো বেশ দেরি আছে। আমি বিছানায় হাঁটু ভাঁজ করে বসে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে থাকি। ইশ—কী একটা স্বপ্ন!

এই একটা নতুন ঝামেলা শুরু হয়েছে— প্রায় প্রতি রাতেই একই ব্যাপার, ঘুরে ফিরে এই একই স্বপ্ন। আমি টেবিলের উপর হাত বিছিয়ে বসে আছি, আর একটা ন্যাটো মানুষ— তার সারা শরীর লোম দিয়ে ঢাকা, একটা হাতুড়ি নিয়ে চিৎকার করে আমার হাতের আঙুলগুলো একটা একটা করে থেঁতলে দিচ্ছে, প্রচণ্ড আঘাতে আমার আঙুল থেকে নখ ছিটকে বের হয়ে আসছে আর আমি চেঁচাচ্ছি। কি ভয়ানক ব্যাপার! কেন আমি এরকম একটা জিনিস দেখছি? মিলিটারি আমাকে ধরে নিয়ে দুই মাস আটকে রেখেছিল সত্যি কিন্তু আমার উপর সে রকম কোন অত্যাচার তো করেনি। দেশ স্বাধীন হবার পর গলায় ফুলের মালা দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করে আনা হল আমাদের। গলা কাঁপিয়ে আমি একটা ছোটখাট বক্তৃতাও দিয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু এখন একি ব্যাপার? যত দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হচ্ছে অবস্থা, আগে মাসে এক-দুই দিন দেখতাম স্বপ্নটা, তারপর সপ্তাহে এক-দুই দিন আজকাল প্রায় প্রতি রাতেই দেখি। এমন অবস্থা হয়েছে যে ইদানিং তো ঘুমোতে যেতেই ভয় করে।

বালিশের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরালাম,

মাত্র দুটি সিগারেট রয়েছে, রাতে নতুন একটা প্যাকেট খুলেছি এর মাঝেই সবশেষ। এত সিগারেট খেলে তো এমনিতেই যক্ষা টক্ষা কিছু একটা হয়ে যাবে।

সিগারেটে দুটি টান দিয়ে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হল। স্বপ্ন তো স্বপ্নই, এটা নিয়ে মাথা গরম করে কি হবে? বেঁচে ফিরে এসেছি সেটাই বড় কথা, সেটা নিয়েই তো খুশি থাকা উচিত। কয়জন আর মিলিটারির হাত থেকে আস্ত ফিরে এসেছে?

সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে ধরে আমি বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম, আজ মনে হয় আর ঘুম আসবে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই মনটা ভাল হয়ে গেল, ভোরের প্রথম আলোতে সবকিছু এত সুন্দর দেখায় কেন? বাইরের এই হতশ্রী জায়গাটাও এখন কি মায়াময় লাগছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে পড়ল আজ এপ্রিলের চার তারিখ, আমার মায়ের মৃত্যু দিবস। প্রথম মৃত্যু দিবস। কি আশ্চর্য দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল?

আজকাল মারা যাওয়ার ব্যাপারটি কেমন জানি সহজ হয়ে গেছে। যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন মায়ের একবার অসুখ হয়েছিল, খারাপ রকমের নিমোনিয়া। কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম, মনে হত যদি মরে যান তখন কি হবে? ভয়ের চোটে একবারে সত্যি সত্যি পেট নেমে গিয়েছিল আমার। মা যখন সত্যি সত্যি মারা গেলেন তখন কিন্তু ঠিক করে কেমন জানি সব কিছু বুঝতে পারলাম না, দুঃখ টুঃখ বেশি হল না, মনে হল এরকমই তো হবে। তখন অবিশ্যি একটা ঘোরের মাঝে ছিলাম, মিলিটারির ভয়ে আতংকে দিশেহারা হয়ে দুদিন থেকে হাঁটছি, মা'র জ্বর, ভাল হাঁটতে পারেন না, ধরে ধরে কোনভাবে নিয়ে যাই। বিকেলের দিকে রাস্তার পাশে বসে বমি করলেন, সন্ধের দিকে বললেন, আমি আর পারি না, তোরা যা। শুনে দুঃখ নয়, হতাশা নয়, সবাই কেমন জানি মায়ের উপর রেগে উঠল। একবছর পর এখন সেই ঘটনা মনে পড়ে আমার এত লজ্জা লাগতে লাগল যে বলার নয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষদের শূয়োরের বাচ্চা মিলিটারিরা কী রকম হৃদয়হীন অমানুষ করে দিয়েছিল!

মা মারা গেলেন এপ্রিলের চার তারিখ, রোববার। তারিখটা বের করেছিলাম পরে, তখন দিন তারিখের কথা মনে ছিল না। একটা অচেনা গ্রামে অপরিচিত একজন মানুষের বাড়ির বারান্দায় শুয়ে আমার মা, যিনি সেই যুগে বাংলায় এম.এ. পাশ করেছিলেন চুপচাপ মারা গেলেন। মোটামুটি যান্ত্রিক দক্ষতায় তাকে একটা পুকুর পাড়ে কবর দেয়া হয়েছিল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমার পুরো ঘটনাটি মনে পড়ে গেল, আর কেন জানি বেশ একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। আঁখু যে লোহ ছবিতে এরকম একটা সিনেমার নায়ক ঠিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

আজকে ভাল একটা কিছু করতে হবে মায়ের জন্য। মোটামুটি দুর্বল চরিত্রের মানুষ আমি, ভাল কিংবা খারাপ কোনকিছুই করতে পারি না। তবুও আমার এম.এ.পাশ মায়ের

জন্য—যিনি আকারে ছোটখাট এবং কোমল স্বভাবের ছিলেন, যাকে দাফন করে আমরা প্রচণ্ড খিদে নিয়ে গুড় দিয়ে পেট ভরে রুটি খেয়েছিলাম—তাঁর জন্য আমার কিছু একটা করার ইচ্ছে হল। বেঁচে থাকলে কি করলে মা সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন? আজ সেটাই করব আমি।

মা ধার্মিক মহিলা ছিলেন। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল তখন মা বঙ্গবন্ধুর নামে খতমে ইউনুস পড়া শুরু করলেন, তার ধারণা হল বঙ্গবন্ধুর উপর অনেক বড় বিপদ। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার পড়বেন, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জুয়ালেমীন, যার অর্থ মনে হয় 'হে খোদা এই জালিমের হাত থেকে তুমি রক্ষা কর'। কে জানে আমার মায়ের দোয়ার জোরেই বঙ্গবন্ধু বেঁচে ফিরে এসেছেন কী না। আমার মায়ের জন্যে কেউ খতমে ইউনুস পড়েনি, তাই মা আর বাঁচতে পারলেন না। জালিমের হাত থেকে পালাতে গিয়ে একজনের বারান্দায় শুয়ে মারা পড়লেন।

মায়ের জন্যে কী একটা খতমে ইউনুস পড়ব? নাহ! যে মারা গেছে তাকে জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করে কি হবে? তাহলে কি নামায পড়া শুরু করব? মা সবসময় বলতেন, নামায পড়, নামায পড় অন্তত জুম্মার নামাযটা পড়। আজ কি একবার নামায পড়ে দেখব? মা বেঁচে থাকলে তো খুবই খুশি হতেন, অজু করে কি বসে যাব ফজরের নামাযে? আইডিয়াটা খারাপ না, শুধু একটা সমস্যা, আত্তাহিয়াতু ভুলে গেছি। সেই কবে ছেলেবেলায় শিখেছিলাম এতদিন পরে কি মনে থাকে? তবু বার কয়েক চেষ্টা করে দেখলাম পুরোটা মনে করতে পারলাম না।

নাহ্ অন্য একটা কিছু করতে হবে।

সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলে কেমন হয়? বুকের ভেতরে হঠাৎ আমার আবেগের মত একটা জিনিসের সৃষ্টি হল। মা দু চোখে দেখতে পারতেন না সিগারেট, ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে যখন চেষ্টা চরিত্র করে সিগারেট খাওয়া শিখে ফেললাম মা যে কি বিরক্ত হয়েছিলেন তা আর বলার নয়, কিছু বলতেও পারতেন না, আবার না বলেও থাকতে পারতেন না। সেই সময়ের কথা মনে করে আজ মায়ের মৃত্যু দিবসে আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম। বালিশের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে গভীর আবেগের সাথে বললাম, মা তোমার কথা মনে করে আজ থেকে আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলাম। এই দেখ—বলে আমি অবশিষ্ট সিগারেটটিকে ছিঁড়ে দুই টুকরো করে ফেলে বললাম, আজ থেকে সিগারেট খাই তো গু খাই।

মায়ের মৃত্যুদিবসে এরকম একটা প্রতিজ্ঞা করে আমার ভেতর একটা গভীর ভাবের সৃষ্টি হল, সেই ভাবটা টাটকা টাটকা থাকতেই সাত সকালে গোসল করে ফেললাম। নাস্তা করা পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু চায়ে চুমুক দিয়েই বুঝতে পারলাম হঠাৎ করে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেয়াটা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। গত দুই বছর থেকে আমি সকালে চায়ের সাথে একটা করে সিগারেট খেয়ে আসছি, শরীর প্রাত্যহিক নিকোটিনের এই ডোজে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আমার নিজের মায়ের পুণ্য স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যত ইচ্ছেই থাকুক আমার বুক একটু সিগারেটের ধোঁয়ার জন্যে প্রায় খেপে গেল। আমি নেহায়েতই দুর্বল চরিত্রের মানুষ, কাজেই একটু পরেই সকালে ভেঙে দুই টুকরো করে রাখা সিগারেটটা খুঁজে বের করে ধরাতে বাধ্য হলাম। মা তুমি আমাকে মাপ করে দিও, আজ আমি তোমার জন্যে অন্য একটা কিছু করব।

সকাল সাড়ে আটটায় একটা ক্লাস আছে। এত সকালে ক্লাসে আমি কখনো যাই না, শামীমের সাথে ঠিক করা আছে, সে আমার হয়ে প্রক্সি দিয়ে দেয়। আজ যখন এত ভোরে উঠে গেছি, ক্লাসটাতে হাজির হলে কেমন হয়? ব্যাপারটি চিন্তা করে আহ্লাদিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমার ভেতরে আবার আবেগের মত সেই জিনিসটার জন্ম নিল। মায়ের মৃত্যুদিবসে আজ আমি সৎভাবে থাকব, কেউ আমার ক্লাসে প্রক্সি দেবে না, আমি কারো ক্লাসে প্রক্সি দেব না, সারাদিন মিথ্যা কথা বলব না, মেয়েদের শরীরের দিকে লোভীর মত তাকিয়ে থাকব না, গর্দান মোটা আজিজের ঘাড় ভেঙে চা সিগারেট খাব না, ফাইভ ফিফটি ফাইভের লোভে আরশাদের মোটা মোটা রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়ব না।

ব্যাপারটা সিগারেট ছেড়ে দেবার মত এত কঠিন হবার কথা নয়, তা ছাড়া সারা জীবনের জন্যে তো প্রতিজ্ঞা করছি না, করছি শুধু একদিনের জন্য। আমার ভালমানুষ মায়ের কথা মনে করে একদিন একটা খাঁটি মানুষের মত থাকার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? আমি, জাফর ইকবাল, উনিশ'শ, বাহাত্তর সালের চৌঠা এপ্রিল সকাল সাতটা আটচল্লিশ মিনিটে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে একটা খাঁটি মানুষের মত থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

অভ্যাসের অভাবে সকাল সাড়ে আটটার ক্লাসে নয়টা বাজার আগেই গভীর ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করে আমার চোখ খুলে রাখার চেষ্টার করতে থাকলাম, সকালে এত বড় একটা প্রতিজ্ঞা করে ক্লাসে ঘুমিয়ে যাওয়া ঠিক না। পয়তাল্লিশ মিনিটের ক্লাস শেষ হতে মনে হল এক যুগ লেগে গেল। ক্লাস থেকে বের হতেই শফিক আমার কাছে এসে গলা নামিয়ে বলল, ইকবাল, এদিকে আয় তোর সাথে কথা আছে।

শফিক একটা রাজনৈতিক চরিত্র। ময়লা শার্ট, মোটা গলা এবং ভারী চশমা নিয়ে সে সহজ সরল বিষয়কে ঘোরালো করে তার ভেতর থেকে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

বের করে ফেলে। ক্লাসের বেশির ভাগ মেয়েরা ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়ে ফেলায় শফিকের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা আর ছেলেদের মাঝে বেশি সুবিধা করতে পারছে না। মিলিটারি আমাকে ধরে প্রায় দুই মাস আটকে রেখেছিল বলে আমার প্রতি শফিকের একটা শ্রদ্ধা মেশানো বিশ্বাস রয়েছে এবং প্রয়োজনে সে আমার সাথে কথা বলে থাকে। আজও গলা নামিয়ে বলল, ইকবাল, ব্যাপার বেশি সুবিধের না।

কেন কী হয়েছে?

খোরশেদ শালা বিট্রে করেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এরপর আমাকে শফিকের মুখ থেকে খোরশেদ নামে আরো একজন রাজনৈতিক চরিত্রের কার্যকলাপের বিশদ বর্ণনা শুনতে হল।

আমি আমার মুখে বিষয়টির উপযোগী গাম্ভীর্য ধরে রেখে বললাম, হুঁ। কেস সিরিয়াস। এখন কী করা যায়? শফিক গলা নামিয়ে বলল, তোকে ঐ শালা এখনো নিউট্রাল লোক মনে করে। তুই যদি শালাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলিস। এরপর শফিক আমাকে বলে দিল খোরশেদ নামক ছেলেটিকে, যাকে শফিক শ্যালক বলে সম্বোধন করছে, তাকে কি কি বানানো কথা বলতে হবে।

বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমি আগেও বিভিন্ন জায়গায় নানারকম বানানোর কথা বলেছি, আমার বিবেক কখনো সে কারণে আমাকে যন্ত্রণা দেয়নি। তাছাড়া শফিককে হাতে রাখাটা খারাপ নয়, তার অনেকগুলো বিশ্বস্ত চামচা রয়েছে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি বলে দিব।

বলেই আমার মনে পড়ল আজ আমার খাঁটি মানুষের মত থাকার কথা, আজ সকল রকম মিথ্যাচার বন্ধ। সাথে সাথে আমি মুখটি গম্ভীর করে বললাম, শফিক—

কী? দোস্ত, আজ হবে না। আজ আমি কারো সাথে মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

কী করতে পারবি না?

মিথ্যা কথা বলতে পারব না।

শফিক প্রথমে ভাবল এটি কোন এক ধরনের রসিকতা, তাই সে টেনে টেনে খানিকক্ষণ হাসল, কিন্তু আমি তবু মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইলাম দেখে সে খানিকক্ষণ আমার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর আর একটি কথাও না বলে চলে গেল। ব্যাপারটি ভাল হল না। ময়লা শার্ট, মোটা গলা এবং ভারী চশমার শফিককে চটানো ঠিক নয়, তার সাথে সব মাস্তানদের খাতির। আমি নিজে দেখেছি তার এক বিশ্বস্ত চামচা শার্টের নিচে একটা জং ধরা পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ক্যান্টিনে আজিজকে পাওয়া গেল। তার দুপাশে দুজন বসে আছে, সবসময় তার সাথে কেউ না কেউ বসে থাকে। আজিজ মালদার পার্টি, আমাদের ক্লাসে যে দুজন

ছেলে গাড়ি হাকিয়ে আসে তার একজন হচ্ছে আজিজ, তার বাবার বিস্কুটের ফ্যাক্টরি রয়েছে, কাজেই তার ঘাড় ভেঙে খাওয়া নতুন কোন ব্যাপার নয়। আজিজের বুকে আড়াআড়িভাবে বসানো আছে একটা মস্ত হৃদয়, এই হৃদয়ের কোন অবসর নেই। সব সময়েই সেটা কোন না কোন মেয়ের জন্যে নিবেদিত, যদিও সেই মেয়েটি কখনোই তার খবর পায় না। আজিজের সুবিশাল হৃদয় তৈরি করতে গিয়ে যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে টান পড়েছে তার একটি হচ্ছে মস্তিষ্ক। আমার ধারণা তার খুলি খুলে দেখলে সেখানে কাঁঠালের বিচির মত ছোট একটা মস্তিষ্ক পাওয়া যাবে। তার কাছে বসে গল্প গুজব করা কোন সুখকর ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাকে হাত নেড়ে ডাকায় তার কাছে গিয়ে বসতে হল। আজিজের সাথে বসে আছে ফখরুল আর সুমন। সুমন ছেলেটির চেহারা ভাল বলেই কিনা জানি না মেয়েরা তাকে খুব লাই দেয়। এই শালা মেয়েদের সাথে অবলীলায় তুই তুই করে কথা বলে এবং মেয়েরাও তাকে বলে 'দেব একটা থাপ্পড়' বা 'দেব একটা চড়'। শুনে সেও দেখি হি হি করে হাসে। সুমন ব্যাটা বজ্জাত কম না, সেদিন দেখি কয়জন মেয়ে সিঁড়ির উপরে বসে আছে। এই শালা ঠেলেঠুলে তাদের মাঝখানে জায়গা করে বসে পড়ল। কি যেন একটা মজার ব্যাপার আর মেয়েদের কী খিল খিল হাসি! শুনেই আমার গা জ্বলে যায়। মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশের প্রয়োজন হলে আজিজ সবসময়ই এই অভিজ্ঞ মানুষটির শরণাপন্ন হয়, কে জানে আজকেও তাই হচ্ছে কিনা।

সুমন আমার দিকে চোখ টিপে বলল, দোস্ত, অবস্থা খুব সিরিয়াস।

আমি বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

আজিজের সাথে ফোরটি থ্রী'র লদকা লদকি।

আজিজ একটু লজ্জা পেয়ে বলল, যা শালা বাজে কথা বলিস না।

রোল নাম্বার ফোরটি থ্রী ক্লাসের সুন্দরী মেয়েগুলোর একজন, অনেকেই লদকা লদকির জন্যে ঘুরোঘুরি করছে এদের মাঝে আজিজের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে তার কোন সম্ভাবনা নেই। বিড়াল যে রকম ইঁদুরের বাচ্চাকে নিয়ে খেলে সুমন আর ফখরুলও এই গর্দভকে নিয়ে সেভাবে খেলছে। আমি বসতেই সুমন গলা নামিয়ে ষড়যন্ত্রীদের মত কথা বলতে শুরু করল, কথার বিষয়বস্তু হল লাইব্রেরিতে বই নিতে গিয়ে রোল নাম্বার ফোরটি থ্রীর সাথে আজিজের কি কি কথা হয়েছে এবং সেটার প্রকৃত অর্থ কি। অন্যদিন হলে আমিও এটাতে যোগ দিয়ে প্রমাণ করে ছেড়ে দিতাম যে পুরো ব্যাপারটি আজিজের প্রতি রোল নাম্বার ফোরটি থ্রীয়ের গোপন অনুরাগের একটি বহিঃপ্রকাশ। এখন আজিজের কি করা উচিত সেটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা শুরু করে দেয়া হত। আজ অন্য ব্যাপার, ঠিক করে রেখেছি যে খাঁটি মানুষের মত থাকব। কাজেই এই ছেলেমানুষী এবং সম্ভবত হৃদয়হীন ব্যাপারে যোগ দেয়া গেল না। সুমন আরেকবার ব্যাপারটি অন্য একটি দৃষ্টি

থেকে বিশ্লেষণ শুরু করতেই আমি মেঘ স্বরে বললাম, সুমন।

সুমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে হাতের আধ খাওয়া ফাইভ ফিফটি ফাইভটা আমার দিকে এগিয়ে দিল, এটা নিশ্চিতভাবে আজিজের প্যাকেট থেকে নেয়া। আমি অভ্যাসবশত প্রায় নিয়েই নিচ্ছিলাম। হঠাৎ করে প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল, আজ আর কোন রকম দীনতা নয়। তাছাড়া শালা সুমনের ঠোঁটে বিশ্রী রকমের একটা ঘা দেখা যাচ্ছে। কে জানে সেটা ছোঁয়াচে কি না। হাত নেড়ে ফিফটি ফাইভকে উপেক্ষা করে আজিজকে বললাম, আজিজ তোর মাথায় কী ঘিলু বলে কিছু নেই?

'কানাকে কানা বলিতে হয় না', 'খোড়াকে খোড়া বলিতে হয় না,' সেরকম মনে হয় 'বোকাকেও বোকা বলিতে হয় না', কারণ আমার প্রশ্ন শুনে আজিজ একেবারে ঘ্যাক করে ক্ষেপে উঠল চোখ লাল করে বলল, কী বললি? কি বললি তুই?

কিছু বলি নি, জিজ্ঞেস করেছি। তোর মাথায় কী ঘিলু বলে কিছু আছে?

মুখ কাল করে আজিজ বলল, কেন কী হয়েছে?

এই শালারা তোর সাথে রং তামাশা করে ইয়ারকি মারে আর তুই ভাবিস দুনিয়া জাহানের সব মেয়ের সাথে তোর প্রেম? প্রেম এত সোজা? তাও তোর মত গর্দভের সাথে? শালা গরু কোথাকার।

আজিজ একবারে ফ্যাকাসে মেরে গেল। সুমন আর ফখরুল আমার কাছ থেকে এরকম একটা জিনিস আশা করেনি, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অপ্রস্তুতের মত কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল, কারণ আমি দেখতে পেলাম শফিকের সাথে তার দলের একজন বড় চাঁই এবং কয়েকজন চামচা আমাদের দিকে আসছে, তার মাঝে একজন হচ্ছে শফিকের বিশেষ বিশ্বস্ত যে কোমরে একটা জং ধরা রিভলবার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেরেছে!

দলের বড় চাঁইয়ের সাইজ বেশ ছোট। উঁচু জুতা এবং কোকড়া চুলকে ঝাউগাছের মত উপরে তুলে দিয়েও সর্বোচ্চ উচ্চতা মনে হয় চার ফিট তিন থেকে এক আঙুল বেশি হবে না। চাঁইটা আমাদের কাছে এসে সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মধুরভাবে হাসল।

উত্তরে আমি আমার শুকনো ঠোঁটকে জিব দিয়ে ভিজিয়ে মধুরভাবে হাসার চেষ্টা করলাম। চাঁই আমার পাশে এসে বসল এবং সাথে সাথে আজিজ এবং তার সাথে ফখরুল আর সুমন চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, এই ক্ষুদ্রাকৃতির চরিত্রটি এই এলাকায় বাট্টু গুণ্ডা নামে পরিচিত।

বাট্টু গুণ্ডা আমার উরুতে একটা থাবা দিয়ে বলল, কী?

এটি ঠিক প্রশ্ন হতে পারে না, তাই আমি উত্তর না দিয়ে আবার একটু হাসার মত ভান করলাম।

কী শুনি?

এটি একটি প্রশ্ন, উত্তর দেয়া প্রয়োজন। মুখে অবিচলিত ভাব ধরে রাখার জন্যে সময় নিয়ে ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরালাম, লম্বা একটা টান দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী শুনেন?

তুমি নাকি ভোল পাল্টাচ্ছো? শার্ট খুলে নাকি পেটিকোট?

ইঙ্গিতটি স্পষ্ট, শফিকের দল ছেড়ে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিচ্ছি কি না জিজ্ঞেস করছে। আমি তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুখে একটা বাঁকা হাসি টেনে এনে বাম হাতের বুড়া আঙুলি দিয়ে খুব তাচ্ছিল্যের সাথে শফিককে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার শোনার যন্ত্র কী একটাই, না আরো আছে?

ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন বাট্টু গুণ্ডা এটাকে খুব উঁচু দরের রসিকতা হিসেবে ধরে নিল। সে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ করে দুলে দুলে হাসতে শুরু করে। বেশির ভাগ মানুষকে হাসলে ভাল দেখায়, এর বেলায় সেটি সত্যি নয়। এর মাড়ি কৃষ্ণবর্ণ এবং হাসার সময় হায়েনার মত মাড়ি বের হয়ে আসে। আমি কখনো হায়েনা দেখিনি কিন্তু আমি নিশ্চিত হায়েনা দেখতে অনেকটা এরকম। বাট্টু গুণ্ডা যেভাবে হঠাৎ হাসি শুরু করেছিল ঠিক সেভাবে হঠাৎ করে হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাদু ভাই কেমন আছেন?

আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম, কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝতে যে সে আমার বাবার কথা বলছে। আমার বাবার ডাক নাম কাদু, এখন শুধু আমাদের গ্রামের বাড়ির কিছু বয়স্ক লোকেরা তাকে কাদু নামে ডাকে। আমি শুনেছিলাম এই বাট্টু গুণ্ডা আমাদের গ্রামের বাড়ির এলাকা থেকে এসেছে। এর আগে কখনো সে সেই সম্পর্কটা ব্যবহার করেনি, আজ করল। আমি বললাম, ভাল আছেন।

বাট্টু গুণ্ডা একটি ছোট কিন্তু দর্শনীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভাল আর কিভাবে থাকবেন। ভাবীকে ছাড়া—ওফ! সে গভীর একটা দুঃখের ভান করে মাথা নাড়তে থাকে।

আমি টের পেতে থাকি যে আমার মেজাজ আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কয়দিন আগে দেখা হয়েছিল কাদু ভাইয়ের সাথে, ইশ, চেনা যায় না দেখে। বাট্টু গুণ্ডা মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, মানুষের মন ভেঙে গেলে আর কিছুই ঠিক থাকে না। কী চেহারা ছিল কাদু ভাই এর? আর এখন।

বাবা ভালোই আছেন।

বাট্টু গুণ্ডা আমার কথায় একটু অসন্তুষ্ট হল বলে মনে হল। একটু রেগে বলল, এরকম অবস্থায় মানুষ ভালো থাকে কেমন করে?

আমার কী হলো জানি না এক গাল হেসে বললাম, বাবা আবার বিয়ে করেছেন।

বাট্টু গুণ্ডা অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, ঠিক বুঝতে পারছিল না আমি ঠাট্টা করছি কিনা। আমতা আমতা করে বলল, কাদু ভাই? কাদু ভাই?

হ্যাঁ। বিয়ে করেছেন।

কা-কাকে?

একটা মেয়েকে। আমাদের আত্মীয় হয়, মেয়ের বাবাকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে, তাই বাবা পরিবারটির একটু উপকার করার চেষ্টা করছেন। আমি এবারে দাঁত বের করে একটু হাসার মতো ভঙ্গি করলাম।

উপস্থিত অন্যদের এই প্রথমবার একটু কৌতূহলী হতে দেখা গেল। একজন জিজ্ঞেস করল, আপনার বাবার বয়স কত?

পঞ্চাশ।

মেয়ের?

কুড়ি বাইশ। একেবারে থৈ থৈ যৌবন। বলব না বলব না করেও বলে ফেললাম, দেখলে মুখে পানি এসে যায়।

বাট্টু গুণ্ডা বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের কথা শুনে আমি নিজেও একটু অবাক হয়ে গেলাম, এই প্রথমবার বুঝতে পারলাম বাবা নামক চরিত্রটির উপর আমি কি পরিমাণ ক্ষেপে আছি।

ব্যাপারটি শুরু হয়েছে সূক্ষ্মভাবে। একদিন সকালে দেখলাম বাবা গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন, জন্মের পর থেকে দেখে আসছি তার নবাব সিরাজদ্দৌলার মত গোঁফ, হঠাৎ করে সেটা কামিয়ে ফেলায় তাকে একটা মেয়ে মানুষের মত দেখাতে লাগল। গোঁফ কামানোর রহস্যটা তখন বুঝতে পারিনি। কিন্তু কয়দিন পর যখন তার কাস্টমসের এক বন্ধু তাকে এক বোতল বিলিতি কলপ দিয়ে গেল তখন সেটা পরিষ্কার হল। পাকা চুল কলপ দিয়ে কালো করা যত সোজা পাকা গোঁফকে কালো করা তত সোজা না। একটা দুইটা হলে টেনে তুলে ফেলা যায় কিন্তু অর্ধেক পেকে গেলে কামিয়ে ফেলা ছাড়া গতি নেই। বিলিতি কলপের কি কেরামতি, রাতারাতি না হয়ে আস্তে আস্তে করে চুল কালো হতে শুরু করল, মাসখানেক পরে দেখি বাবাকে আর চেনা যায় না, বয়স চোখ বুজে কুড়ি বছর কমিয়ে ফেলেছেন!

এরপর বাবা যে খেল দেখালেন তার কোন তুলনা নেই। একদিন বললেন, ঘর বাড়ি অনেকদিন থেকে চুনকাম করা হয়নি, তাই ঘর চুনকাম করা হবে। দেওয়াল থেকে সব ছবি নামিয়ে ঘর চুনকাম করা হল, তারপর আবার সব ছবি টাঙানো হল—দুটি ছবি ছাড়া। মায়ের একটা বড় ছবি আর বাবার আর মায়ের বিয়ের ছবি। খবরের কাগজে মুড়িয়ে অনেকদিন সে দুটি স্টোর রুমে ফেলে রাখা হয়েছিল, পুরোপুরি গায়েব হবার আগেই আমি মায়ের ছবিটা আমার ঘরে সরিয়ে এনেছি।

আমার ভবিষ্যৎ মা কয়েকবার তার ভাইদের সাথে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছেন, বাবা ছোক ছোক করে তার আশে পাশে ঘুরে বেড়ান আর তিনি একেবারে কাঠ হয়ে বসে থাকেন। অপদার্থ ভাইগুলো জোর করে এই কমবয়সী কপাল খারাপ মেয়েটিকে বাবার মত একজন বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

বাবার খবরটি দেবার পর বাট্টু গুণ্ডার উচ্ছ্বাসে একটু ভাটা পড়ে গেল। খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ে বলল, আমি উঠি। একটু থেমে যোগ করল, তাহলে সেটাই ঠিক থাকল।

কি বলতে চাইছে পরিষ্কার বুঝতে পেরেও আমি না বোঝার ভান করলাম, কী ঠিক থাকল?

শফিক তোমাকে যেটা বলেছে।

আমি মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় বললাম, আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না।

কবে থেকে পীর হয়ে গেলে?

আজ থেকে।

বাট্টু গুণ্ডার মুখ লাল হয়ে ওঠে। এই ধরনের চরিত্রগুলো রেগে গেলে বিপদ, এরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, লোকজনের সামনে একটা কিছু অপমান করে ফেলতে পারে। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি। সাথের দুই চামচা একটু এগিয়ে আসছিল, বাট্টু গুণ্ডা তাদের থামিয়ে বলল, এতদিন কোন ঝামেলা টের পাও নাই, কারণ সবাইকে বলেছি তুমি আমাদের দিকে আছ। যদি না থাক ক্ষতি নাই কিন্তু যদি বিট্রে কর, বলে রাখলাম বড় ঝামেলা হয়ে যাবে।

বাট্টু গুণ্ডা, তার পিছনে শফিক এবং সবার পিছনে দুই চামচা হেঁটে হেঁটে বের হয়ে গেল। ক্যান্টিনের সবাই মাথা ঘুরিয়ে প্রথমে তাদের এবং তারপর আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। মা, তোমার মৃত্যুবার্ষিকীতে সত্যি কথা বলার প্রতিজ্ঞা করে দেখ কী রকম ঝামেলায় ফেঁসে যাচ্ছি।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে ক্যান্টিনে বসে রইলাম, সত্যি কথা বলতে কী পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে আমার বেশ ভালই লাগল, কে জানে আমার চরিত্রটা হয়তো যতটা দুর্বল ভেবেছিলাম ততটা দুর্বল না, বাট্টু গুণ্ডার মুখের উপর ওরকম কথা কয়জন বলতে পারে?

আজ পরপর বেশ কয়েকটা ক্লাস, কোনটা ফাঁকি না দিয়ে একটার পর আরেকটা চালিয়ে গেলাম। অন্যদিনের মত ফোরটি স্ট্রীর শরীরের দিকে না তাকিয়ে স্যারেরা কি

বলছেন বোঝার চেষ্টা করলাম। দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে মস্তিষ্ক কাজ করতে চায় না, পড়াশুনা করি না, ক্লাস বহুদূর এগিয়ে গেছে সেটাও আরেকটা সমস্যা। অনার্সের আগে তিন মাস দরজা বন্ধ করে পড়ে পড়ে সব সামাল দিতে হবে, এখন দিতে পারলে হয়!

তিনটার দিকে সব ক্লাস শেষ করে আমরা কয়জন বারান্দায় বসে আড্ডা মারছিলাম। রসালো বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, কার ঘর থেকে কার জানালার ভেতর দিয়ে শোয়ার ঘরে কি দেখা যায় এসব। আমি জোর করে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি, আজকের দিনটাতে অন্তত একটা দৃঢ় চরিত্র দেখাতে হবে। ঠিক এরকম সময়ে সামনে লাল রংয়ের ভারী সুন্দর একটি গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামল একটা মেয়ে, দেখতে একেবারে যাকে বলে আগুনের মত সুন্দরী। কয়েক পুরুষ ধরে বড়লোক হলেই মনে হয় মানুষের ভেতর ফিল্টার করে করে এরকম সৌন্দর্য এসে জমা হয়। আমাদের ভেতর একটা চাপা উচ্ছ্বাসের বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এতগুলো ছেলে মেয়েটার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে, তবু মেয়েটিকে খুব একটা বিব্রত হতে দেখা গেল না, বেশ সপ্রতিভভাবে হেঁটে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। কাছে এসে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কী ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ছাত্র?

সুমন বলল, হ্যাঁ, আমরা সবাই কপাল পোড়া।

মেয়েটি একটু ভদ্রতার হাসি হেসে বলল, থার্ড ইয়ারের কী কেউ আছেন?

সুমন একগাল হেসে বলল, আপনার কপাল খুবই ভাল, সবাই আমরা থার্ড ইয়ারের।

আপনারা কী জাফর ইকবাল নামে কাউকে চেনেন?

সবাই ঘুরে আমার দিকে তাকাল, ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, এরকম সুন্দরী একটা মেয়ে আমাকে খোঁজ করতে পারে।

আমি ঢোক গিলে বললাম, আমি জাফর ইকবাল।

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, আমার ভুলও হতে পারে। কিন্তু মনে হল একটু যেন হতাশ হল। শালার চেহারাটা এরকম যে যেই দেখে কেমন জানি সন্দেহের চোখে দেখে। মেয়েটি ইতস্তত করে বলল, আপনার সাথে একটা কথা বলতে পারি?

আমি উত্তেজনায় প্রায় দাঁড়িয়ে গেলাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়।

মেয়েটি একটু এগিয়ে গেল। আমি উপস্থিত সবার ঈর্ষার পাত্র হয়ে পিছু পিছু এগিয়ে গেলাম, সুমন সবাইকে শুনিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, এমন একটা বেহায়া ছেলে।

আমার নাম রুখসানা। রুখসানা হাসান।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমি শুনেছি যুদ্ধের সময় আপনাকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ দু'মাস আমি ক্যান্টনমেন্টে আটক ছিলাম। মুখে আমি ক্যান্টনমেন্টে আটকা থাকার দুঃসহ জীবনের উপযোগী একটি ভাব আনার চেষ্টা করতে থাকি।

যখন ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন তখন কি আপনি শওকত নামে কাউকে দেখেছিলেন?

শওকত?

হ্যাঁ, আমার ছোট ভাই। মিলিটারিরা অক্টোবর মাসে ধরেছিল। দেখেছিলেন?

হায় খোদা! এ শওকতের বোন? আমার চোখের সামনে হঠাৎ দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। শওকতের হাতটি চেপে ধরে রেখেছে একজন আর আরেকজন একটা হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাতে তার আঙুল থেতলে দিচ্ছে, হাতের নখ ছিটকে ছিটকে বের হয়ে আসছে আর চিৎকার করছে শওকত। চিৎকার—চিৎকার—চিৎকার।

অক্টোবর মাসে ধরেছিল ডেমরার কাছে, পাওয়ার স্টেশনে একটা অপারেশান করতে যাচ্ছিল, আপনার মতনই লম্বা, গায়ের রঙ ফর্সা, কালো ফ্রেমের চশমা। দেখেছিলেন তাকে? দেখেছিলেন?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, মেয়েটির চোখের দিকে তাকাতে পারছি না। কী বলি এখন?

দেখেছিলেন তাকে? খুব আমাদের জানার ইচ্ছে তার জীবনের শেষ সময়টা কিভাবে কেটেছিলো। জানেন আপনি?

হায় খোদা কি বলি এখন মেয়েটাকে? কী বলি?

জানেন তার কথা?

আমি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লাম, জানি।

মেয়েটি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, একটি কথাও না বলে। তারপর খুব আস্তে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনি কি আমাদের বাসায় যাবেন একবার? আমার মায়ের সাথে একটু কথা বলবেন? খুব তার জানার ইচ্ছে কি হয়েছিল।

আমি আমার শুকনো ঠোঁট দুটি জিব দিয়ে ভিজিয়ে বললাম, যাব।

গাড়িতে ওঠার সময় শুনলাম সুমন উচ্চস্বরে একটি হিন্দি গান গাইতে শুরু করেছে বাংলায় যেটার অর্থ, প্রথমবার দেখেই তোমাকে আমার হৃদয় সঁপে দিয়েছি, এখন হৃদয় ছাড়া এই দীর্ঘ রজনী কেমন করে কাটাব? আমি না শোনার ভান করলাম। মেয়েটিকে দেখে বোঝা গেল না সে সুমনের গান শুনেছে কিনা, সুন্দরী মেয়েদের এসব নিশ্চয়ই গা সওয়াও, কখন শুনতে হয় কখন না শুনতে হয় ওদের নিশ্চয় অনেক ভাল করে জানা।

শালা সুমন, ফিরে এসে আমি যদি তোর দাঁত খুলে না নিই।

মেয়েটির চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম যে এরা কয়েক পুরুষ ধরে বড়লোক, বাসাটি দেখে বুঝলাম আমার ধারণা সত্যি। এরকম বাসায় এলসেশিয়ান কুকুর থাকে, বাইরের কেউ এলেই সেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করে। এসব বাসায় অনাহুতভাবে কখনো আসতে হয় না, তাতে ভারী বিড়ম্বনা হয়। আজ অবিশ্যি আমার কোন ভয় নেই। এই বাসার মেয়ের সাথে এক গাড়িতে এসেছি, পিছনের সিটে প্রায় গায়ের সাথে গা লাগিয়ে। তাছাড়া মনে হচ্ছে এ বাসায় কোন কুকুর নেই, গাড়ি থেকে নেমে সোজা বসার ঘরে চলে এলাম। কোন কুকুর তো ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল না।

বসার ঘরটি মনে হয় খুব সুন্দর করে সাজানো। আমার রুচি জ্ঞান খুব সুবিধের নয়, গলায় কাগজের ফুল দেয়া রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখলেই আমি কাত হয়ে যাই, সে তুলনায় এই বাসাতো একেবারে আর্ট মিউজিয়াম। দেওয়ালে বড় বড় দুর্বোধ্য তেলরঙের ছবি, এক কোণায় আধা ন্যাংটা মেয়ের মূর্তি। কালো পাথরের টেবিল ল্যাম্প, মখমলের সোফা! কি নেই এই ঘরটাতে, কোথাও বড় করে একটা শওকতের ছবি থাকবে ভেবেছিলাম, সেটা নেই। কেন কে জানে। বড়লোক বন্ধু-বান্ধবের বাসায় গেলে বাসার কাজের লোক দিয়ে অনেকবার ভেতরে খবর আদান-প্রদান করাতে হয়, দেখা করার জন্যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এখানে এসেও নিজের অজান্তেই তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলাম, কিন্তু মেয়েটি প্রায় সাথে সাথেই একটা গ্লাসে ঠাণ্ডা একটু সরবত নিয়ে ঢুকল। তার পিছনে একজন মহিলা, ঠিক যেরকম হবে ভেবেছিলাম সেরকম। দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এই মেয়ের মা, মনে হয় বড় বোন, কপালের উপর ইন্দিরা গান্ধীর মত এক গোছা পাকা চুল ছাড়া চেহারায় বয়সের কোন ছাপ নেই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, সালাম টালাম কিছু একটা দেব কী না চিন্তা করছিলাম। ভদ্রমহিলা আর সুযোগ দিলেন না, জিজ্ঞেস করলেন, রুখসানা তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসে নি তো বাবা?

আমি একটু হাসার ভঙ্গি করে বললাম, না না কী যে বলেন।

তুমি এসেছ খুব ভাল হয়েছে, না হয় আমি নিজেই যেতাম।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। ভদ্রমহিলা আরো কিছুক্ষণ হালকা কথাবার্তা বলে আসল বক্তব্যে চলে এলেন। শান্ত গলায় বললেন, রুখসানা বলেছে তুমি নাকি শওকতকে ক্যান্টনমেন্টে দেখেছিলে।

আমি মাথা নাড়লাম।

আমি ওর জীবনের শেষ সময়টার কথা তোমার কাছে শুনতে চাই।

আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, তাই কি বলব মনে মনে ঠিক করে নিয়ে প্রায়

মুখস্থ বলার মত করে বললাম, আমাকে আর শওকতকে যারা ধরে নিয়েছিল তারা ছিল মোটামুটি অমানুষ, তারা আমাদের কি করেছে সেটা শুনতে আপনার ভাল লাগবে না।

ভদ্রমহিলা নিঃশ্বাস আটকে রেখে বললেন, আমি তবু শুনতে চাই।

বিশ্বাস করেন শুনে আপনার আরো কষ্ট হবে।

হোক। আমি তবু শুনতে চাই।

কেন?

ভদ্রমহিলা থেমে থেমে প্রত্যেকটা শব্দে জোর দিয়ে বললেন, কারণ শওকত আমার ছেলে, তাকে আমি এইটুকু থেকে আস্তে আস্তে বড় করেছি। তার কাছে দেশ কেমন করে আমার থেকে বড় হয় সেটা আমি বুঝতে পারি না। আমি বুঝতে চাই।

কিন্তু আপনি তো বুঝতে পারবেন না।

ভদ্রমহিলা অসহিষ্ণুর মত বললেন, না বুঝলে নাই, কিন্তু আমি তবু শুনতে চাই।

ঠিক আছে।

তুমি কোন কিছু গোপন করবে না, সব বলবে।

ঠিক আছে।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে কথা বলতে শুরু করলাম।

প্রথমে বললাম তাকে কিভাবে ধরে নিয়ে এল তার কথা, চোখ কেমন করে কাল কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল, হাত দুটি কেমন করে শরীরের পিছন দিকে বাঁধা ছিল সেইসব। হাত খুলে ধাক্কা দিয়ে তাকে ভেতরে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়ার পর শওকত কি কি করল আমি সেগুলোও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বললাম। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না সে ভয় পেয়েছে, সম্ভবত তখনো সে একটা ঘোরের মাঝে ছিল। আমাদের কয়েকজন তার সাথে কথা বলতে চাইলে সে বেশি উৎসাহ দেখায়নি। ডান হাতে কোন রকমের আঘাত লেগেছিল, ঠিক কতটা গুরুতর বোঝা যাচ্ছিল না। ঘণ্টা খানেক আমাদের কয়েকজনকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। প্রায় প্রতি দিনই নেয়, ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন করে, প্রয়োজনে একটু মারপিট করে। আজ সেখানে একজন মিলিটারি অফিসার বসে ছিল, সে শওকতকে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। জিজ্ঞেস করল তার অন্য মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা কোথায়। আমি এইটুকু বলে থামলাম।

ভদ্রমহিলা সাথে সাথে বললেন, তারপর কী হল?

আমি একটু মাথা নিচু করলাম। এখন আমি কেমন করে বলি যে শওকত যখন বলল সে জানে না, সাথে সাথে ঠাণ্ডা মাথায় তার উপর অত্যাচার শুরু হল। কেমন করে বলি যে একজন শওকতের হাত দুটি টেবিলের উপর চেপে ধরল আর একজন একটা হাতুড়ি নিয়ে একটা একটা আঙুল থেতলে দিতে শুরু করল? আমি কেমন করে বলি যে

প্রচণ্ড আঘাতে হাতের নখ উড়ে যেতে শুরু করল? শওকত গরুর মত চিৎকার করতে লাগল—হায় খোদা এসব আমি এখন কেমন করে বলি?

ভদ্রমহিলার চোখ দুটি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল, ভাঙা গলায় বললেন, বল।

রুখসানা একটু এগিয়ে এসে তার মায়ের হাত দুটি ধরল অনেকটা সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে।

আমি আমার শুকনো ঠোঁট দুটি জিব দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিলাম, হায় খোদা, আমাকে তুমি এ কী বিপদে ফেলেছ?

বল কী হল তারপর। ভদ্রমহিলার গলার স্বর ভেঙ্গে গেল হঠাৎ।

আপনি কেন শুনতে চাইছেন? আমি বলছি আপনার শুনতে ভাল লাগবে না।

তবু বল। তবু আমি শুনতে চাই।

আমি এক মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করলাম, মা তোমার মৃত্যুদিবসে মিথ্যা কথা বলব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর পারলাম না মা। আমাকে তুমি মাফ করে দিও। আমি এদের সত্যি কথা বলতে পারব না, তোমার মত আরেকজন মায়ের হৃৎপিণ্ড হাত দিয়ে টেনে আমি ছিঁড়তে পারব না!

বল।

বলছি। আমি কল্পনা করে নিলাম শওকত সুদর্শন অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসারটি জিজ্ঞেস করছে তোমার মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা কই? শওকত উত্তরে কিছু একটা বলবে, কি বলবে? একটু ভেবে আবার শুরু করলাম আমি, বললাম, অফিসারটি শওকতকে জিজ্ঞেস করেছে উর্দুতে। বাংলাদেশের এমন কোন মানুষ নেই যে অল্প বিস্তর উর্দু জানে না, সবাই জানে, আমিও জানি, অন্তত কথা বোঝার মত জানি। শওকত নিশ্চয়ই জানে, কিন্তু সে বলল, আমি উর্দু বুঝি না। বলল ইংরেজিতে। কি সাহস! মিলিটারি অফিসারটি প্রথম কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, এবারেও উর্দুতে। শওকত আবার বলল, আমি উর্দু জানি না। তখন পাশে দাঁড়ানো লোকটি এসে ওকে মারল, প্রচণ্ড জোরে, এত জোরে যে শওকত ঘুরে পড়ে গেল নিচে।

ভদ্রমহিলা মখমলের সোফা তার নখ দিয়ে আকড়ে ধরলেন, মুখ রক্তশূন্য, রুখসানা মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, তার অপূর্ব সুন্দর মুখ পাথরের মত ভাবলেশহীন। মিথ্যা বলতে হয় সত্যির খুব কাছাকাছি করে, না হয় সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। কতবার কত জায়গায় মিথ্যা বলেছি আমি, আমার মত মিথ্যা কে বলতে পারে? আমি আবার শুরু করলাম, শওকত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, দেখলাম তার ঠোঁট কেটে গেছে। হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে সে উঠে দাঁড়াল, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে, অফিসারটির দিকে তাকিয়ে যেটা বলল আমি নিজের কানে না শুনলে সেটা কখনো বিশ্বাস করতাম না। সে বলল, যে

হাত দিয়ে তোমরা আমাকে মারছ, আমি বলে রাখলাম শুনে রাখ, একদিন সেই হাত জোড় করে তোমরা আমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করবে।

ভদ্রমহিলা নিঃশ্বাস আটকে রেখে বললেন, তাই বলল? তাই বলল শওকত?

হ্যাঁ, আমরা ভয়ে পাথর হয়ে গেলাম তার সাহস দেখে। পাশে দাঁড়ানো মিলিটারিটা বুকের কাপড় ধরে টেনে আনল তার কাছে, তারপর হাত তুলল মারার জন্যে, ঠিক যখন মারবে অফিসারটি তাকে থামাল। থামিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, ছেলে, তোমার ভয় করে না?

শওকত বলল, করে।

অফিসারটি বলল, তোমাকে দেখে তো মনে হয় না, তুমি ভয় পেয়েছ।

শওকত তখন একটু হাসল, কী আশ্চর্য ব্যাপার, এরকম অবস্থায় কোনদিন কোন মানুষ হাসতে পারে? হেসে বলল, পৃথিবীতে কোন মানুষ নেই যে মৃত্যুকে ভয় পায় না। তুমি যদি মানুষ হতে তাহলে তুমিও বুঝতে আমি কত ভয় পেয়েছি। কিন্তু তোমরা তো মানুষ নও, তোমরা পশু তাই তোমরা বুঝতে পার না। তোমার সামনে আমি আমার ভয় দেখাব না। কিছুতেই না।

আমরা ভেবেছিলাম শওকতের কথা শুনে অফিসারটি রেগে ফেটে পড়বে কিন্তু সে রাগল না। ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারপর? তারপর কী হল?

আমি আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল শওকতের চেহারা, প্রচণ্ড মার খেয়ে সারা মুখ রক্তে প্রায় মাখামাখি, বাম চোখটা ফুলে প্রায় বুঁজে আছে, আঙুল সব কয়টি থেতলে দিয়েছে, তাকানো যায় না সেদিকে। তার মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা কোথায় বলতে পারছে না দেখে এবারে এক বালতি পানি নিয়ে এসেছে একজন। অফিসারটি ইঙ্গিত দিতেই একজন তার মাথার পিছনে চুলের ঝুটি ধরে তার মাথা বালতির পানিতে ডুবিয়ে ধরল, ছটফট করছে শওকত, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না আর জোর করে ধরে রেখেছে দুজন।

অফিসারটি সময় নিয়ে আস্তে আস্তে একটা সিগারেট ধরাল, তারপর সেটাতে একটা লম্বা টান দিল। কাটা মুরগির মত ছটফট করতে করতে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে শওকত। আমি আর দেখতে পারছি না। চোখ বন্ধ করে বলছি, খোদা একটু দয়া কর, একটু দয়া কর, মেরে ফেল ছেলেটিকে, মেরে ফেল আর কষ্ট দিও না। ঠিক তখন অফিসারটি ইঙ্গিত করল তাকে তুলে ধরতে। মাথা টেনে তুলল পানি থেকে, খোদা আমার কথা শুনেনি, এখনো বেঁচে আছে শওকত। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল বুভুক্ষের মত, একবার, দুইবার, তৃতীয়বার নেবার আগেই আবার তার মাথা চেপে ধরল পানিতে! হায় খোদা আবার কেন আমার মনে করিয়ে দিলে সেই সব? কতবার তাকে এভাবে পানিতে

চেপে ধরে রেখেছিল? কতবার? মানুষ হয়ে কেমন করে মানুষকে এত কষ্ট দিতে পারে? কেমন করে?

ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে, কাঁপা গলায় বললেন, বল তারপর।

আমি জোর করে সরিয়ে দিলাম দৃশ্যটি। চোখের সামনে এসে দাঁড়াল শওকত, কি দৃপ্ত চেহারা তার! সামনে অফিসারটিকে লাগছে একজন ভেঙে পড়া অপরাধী মানুষের মত। আবার বলতে শুরু করলাম আমি, অফিসারটি তখন শওকতকে বলল, আমি তোমার সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি ছেলে। আমার নিজের উপর থাকলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিতাম। এই পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্য, কাপুরুষের জন্যে নয়। কিন্তু আমার উপর আদেশ আছে তোমাকে মেরে ফেলার। তার আগে যেভাবে সম্ভব তোমার মুখ থেকে কয়টা কথা বের করতে হবে। যেভাবে সম্ভব। তোমরা যুদ্ধবন্দী নও, জেনেভা কনভেনশন তোমাদের বেলায় খাটে না। যেভাবে খুশি আমরা তোমাদের উপর অত্যাচার করতে পারি কিন্তু আমি তোমার উপরে কোন অত্যাচার করব না, তোমাকে আমি সম্মান নিয়ে মরতে দেব। তুমি কী প্রস্তুত আছ মরার জন্যে?

ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল শওকতের মুখ, মৃত্যুর মুখোমুখি কি কোন মানুষ এত সহজে দাঁড়াতে পারে? আমি দেখলাম খুব চেষ্টা করে ধীরে ধীরে সে নিজেকে শান্ত করল, তারপর বলল, আমি প্রস্তুত। তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে আমাদের দিকে তাকাল, তাকিয়ে বলল, আমার নাম শওকত হাসান, যদি আপনাদের কেউ বেঁচে থাকেন খোঁজ করে আমার মায়ের সাথে দেখা করবেন। প্লীজ, দেখা করে বলবেন—

আমি থেমে গেলাম। কোন কথা না বলে মা আর মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে দুজনের। সুন্দর একটা কথা বলতে হবে এখন। কী বলা যায়? এক মুহূর্তে ভেবে বললাম, খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিল ইংরেজিতে, কথাটা বাংলায় অনেকটা এরকম, জীবনকে তার দৈর্ঘ্য দিয়ে বিচার কর না, বিচার কর সেটা কত তীব্র ছিল সেটা দিয়ে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার মনে হতে থাকে সত্যিই বুঝি দৈর্ঘ্য নয় তীব্রতাই হচ্ছে জীবনের সবকিছু। ধুকে ধুকে বেঁচে থাকা নয়, প্রচণ্ড উত্তাপে ছারখার করে দেয়া হচ্ছে জীবন, শত্রুর মার খাওয়া নয়, অস্ত্র হাতে তার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হচ্ছে জীবন। মনে হতে থাকে পিশাচের দল যে শওকতকে টেনে হিঁচড়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়েছিল সে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পঙ্গু নয়, সে ছিল জীবনের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল। মনে হতে থাকে আমি যা বলেছি সব সত্যি, শওকত নামের উনিশ বছরের একটা ছেলে সত্যি সত্যি মৃত্যুর মুখোমুখি এসেও প্রচণ্ড অহংকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, কি অসহ্য দীপ্তি ছিল তার চোখে, কী ভয়ংকর পৌরষত্ব তার মুখে, কী আশ্চর্য সৌন্দর্য তার চেহারায়—

আমার চোখে হঠাৎ পানি এসে গেল, ঠোঁট কামড়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলাম আটকাতে, পারলাম না। একুশ বৎসরের ধাড়ী একটা মানুষের চোখ দিয়ে পানি বের হওয়ার থেকে অশালীন আর কিছু হতে পারে না জেনেও আমি কিছু করতে পারলাম না, বসে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললাম ওদের সামনে।

এত দুর্বল আমি কেমন করে হলাম? মা, তুমি কেমন করে আমার মত এমন একটা দুর্বল ছেলের জন্ম দিলে?

কেমন করে দিলে?

বলদ

আমার বাবাকে নিয়ে সাংঘাতিক মুশকিল। শিক্ষা দীক্ষা নাই, দুনিয়ার খোঁজ খবর রাখেন না, সভ্য সমাজ এবং ভদ্রতা বলে যে একটা জিনিস আছে সেটা জানেন পর্যন্ত না। মানুষের সামনে তো মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে লজ্জাতেই পড়তে হয়। বাবার কথা বার্তার ধরণ খুবই খারাপ, অল্পতে রেগে উঠে মুখ খারাপ করে গালাগালি শুরু করেন। আমি যে তার ছেলে তাকে পর্যন্ত দুইবেলা হারামজাদা আর শুওয়ের বাচ্চা বলে এক গালি দেন। একজন বাপ কি কখনো ছেলেকে হারামজাদা বলে গালি দিতে পারে? কিন্তু বাবাকে সেটা বোঝাবে কে? আমি যে আজ বি.এ. পাস করে শহরে একটা ভাল চাকরি করি না, বউ বাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার করি না, তার জন্যে দায়ী কে? দায়ী হচ্ছে আমার বাবা।

ম্যাট্রিকের রেজাল্ট হবার পর যখন কাগজে আমার নাম খুঁজে পাওয়া গেল না বাবা উঠানে আমার সব বইপত্র খাতা কাগজ ফেলে তাতে আধপোয়া কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দাউ দাউ করে বই পত্রের সাথে সাথে আমার শিক্ষা দীক্ষার সব আশাও জ্বলে ছাই হয়ে গেল। নিজের শিক্ষা নাই তাই শিক্ষার মর্যাদা বুঝেন না, না হলে কী কেউ বই পত্র আগুন দিয়ে পোড়ায়? মাত্র দুইবার ম্যাট্রিক দিয়েছি আমি একেক জনে তিনবার চারবার দিয়ে পাস করে। পড়াশোনার এইটুকু সুযোগ কি আমাকে দেওয়া যেতো না? আর ম্যাট্রিক ফেল করেছি বলেই কী আমার কোনো আশা নাই? কাজী নজরুল ইসলাম কী ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন? হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করে নোবেল প্রাইজটা যদি রবীন্দ্রনাথকে না দিয়ে দিত তাহলে সেটা কী নজরুল ইসলাম পেতেন না? কিন্তু বাবাকে সেটা বলে কী লাভ।

বাবার কাণ্ডজ্ঞান যে কত কম সেটার আরেকটা উদাহরণ দিই। আমার বয়স এখন চব্বিশ। এই রকম জোয়ান বয়সে শরীরের যে একটা দাবি থাকে সেটা কে না জানে,

কিন্তু বাবা কী সেটা একবার ভেবে দেখেছেন? আমার বিয়ের খোঁজ খবর কী শুরু করেছেন? মোটেই না। শুধু কি তাই, বাবাকে যদি কেউ আমার বিয়ের কথা বলে বাবা উত্তর দেন, কুব্দুস যেদিন বউকে খাওয়াতে পারবে সেদিন বিয়ে করবে! এটা কী একটা যুক্তির কথা হল? এতোই যদি আমার উপরে অবিশ্বাস তাহলে আমার ভাগের জমি আমাকে লিখে দেন না কেন, কিভাবে বাঘের বাচ্চার মতো থাকতে হয় দেখিয়ে দিই। আমার থেকে দুই বছর ছোট হয়ে রইস উদ্দিন এখন দুই ছেলের বাবা। পান খেতে খেতে দুই বেলা শ্বশুরের দোকানে গদীতে হেলান দিয়ে বসে, হালখাতার সময় গোলাপি রংয়ের কার্ড পাঠায়। আর আমি পান সিগারেটের পয়সার জন্যে গোপনে ধান বিক্রি করি, বাবা একবার ধরতে পারলে আমার কী অবস্থা করবে চিন্তা করেই আমার রক্ত পানি হয়ে যায়।

বাবার কোনো মান সম্মান জ্ঞান নেই। নিজে ভদ্রলোকের মতো থাকতে চান না ভালো কথা। তাই বলে আমি কেন ভদ্রলোকের মতো থাকতে পারব না? চব্বিশ ঘণ্টা আমার পিছনে লেগে আছেন—গরুটা মাঠে নিয়ে যা, গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দে, ক্ষেতে নিড়ানী দে— আমাকে পেয়েছে কি? আমি কি একটা কামলা না কি?

গৃহস্থালি কোনো কাজ যে আমি করি না সেটা মোটেও সত্যি না। কালা গাইয়ের বাছুরটা যখন জোয়ান একটা ষাঁড় হয়ে বড় হল আমি সেটাকে এখানে সেখানে নিয়ে যেতাম। কালো রং ছিল তাই আদর করে নাম দিয়েছিলাম মেঘা, ডাকতো মেঘের মতো গর্জন করে। সেটা একটা দেখার মতো জানোয়ার ছিল। কী তার শিং কী তার কুঁজ আর কী তার তেজ! এই এলাকায় কী কোনো ষাঁড় আছে যেটা তার শিংয়ের গুঁতো খেয়ে লেজ তুলে দৌড় দেয়নি, আছে কি কোনো গাই গরু যে মেঘার সামনে দিয়ে মান ইজ্জত নিয়ে যেতে পেরেছে? নাই। সেই মেঘাকে বাবা একদিন বলদ করে ফেললেন। এতো করে নিষেধ করলাম কিন্তু বাবা আমার কথা শুনলেন না, মেঘাকে নাকি জোয়াল লাগানো যায় না, লাঙল নিয়ে নাকি এদিকে সেদিকে ছুটে যায়। তাই একদিন লালচান মুচিকে ডেকে আনা হল। সবাই মিলে ধরে এতো বড় জোয়ান ষাঁড়টিকে চিৎ করে ফেলল আর লালচান মুচি চাকু দিয়ে কেটে মেঘার বিচি বের করে ফেলে দিয়ে খানিকটা হলুদ বাটা লাগিয়ে দিল। ঘাড়ে জোয়াল নিয়ে মেঘা এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মই টানে, দুনিয়ার আর কিছুতে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। কী একটা দুঃখের ব্যাপার!

এই হচ্ছে আমার বাবা। গরু বাছুর ক্ষেত আর চাষবাস ছাড়া আর কিছু জানেন না, বোঝেন না। কাজেই বাবাকে যখন আমি খবর দিলাম যে তার লাল গরুটাকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়েছে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। প্রথমে তো বিশ্বাস করেন না, যখন অনেক কষ্টে বিশ্বাস করালাম তখন কী পাগলের মতো হাউ মাউ করে কান্না! মানুষের ছেলে মরে গেলেও বুঝি সেরকম করে কাঁদে না। গরুটা আনছিলাম আমি,

গরুকে না নিয়ে আমাকেও তো নিতে পারতো, মিলিটারিরা কী গুলি করে মারার জন্যে জোয়ান ছেলে ধরে নিচ্ছে না? আমি যে জানে বেঁচে ফিরে এসেছি সেটা চিন্তা করে বাবা কী একটু সান্ত্বনা পেতে পারেন না? কিন্তু তার কোনো নিশানা দেখা গেল না, লাল গামছাটা মুখে চেপে ধরে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন। বয়স্ক মানুষ কাঁদলে খারাপ দেখায়, তাও যদি আবার চেহারা ছুরত একটু ভালো হত।

আমি বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম আর সেটাই হল আমার সর্বনাশ। ভুল করে একবার বলে ফেলেছি যে, গরুটাকে এক মিনিটের জন্যে ছেড়েছি আর সাথে সাথে বাবা লাফ দিয়ে উঠল, গরু ছেড়েছিস? কেন ছাড়লি হারামজাদা? কেন ছাড়লি তুই?

আমার হল মুশকিল, অন্য মানুষদের মতো আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না। আবার সত্যি কথাটাই বলি কেমন করে যে, কুলসুমদের বাড়ির কাছ দিয়ে আসার সময় মনে হল বেড়ার ফাঁক দিয়ে কুলসুম তাকিয়ে আছে। একটা শিক্ষিত মানুষ আমি গরুর দড়ি ধরে হেঁটে যাচ্ছি জিনিসটা কেমন দেখায়? তাই আমি দড়িটা ছেড়ে কায়দা করে একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেটের যা দাম সবসময় তো আর সিগারেট ধরাতে পারি না। শালার গরুটা এমন বজ্জাত—যেই দড়িটা ছেড়েছি সোজা সামনে হেঁটে একজনের ক্ষেতে নেমে পড়ল। সেখান থেকে কিছু বোঝার আগে বড় সড়কে আমি কায়দা করে সিগারেটটা ধরিয়েছি এতো সহজে তো যেতেও পারি না। সিগারেটটা শেষ করে যখন গেলাম তখন দেখি গরুর কোনো নিশানা নেই। কীভাবে থাকবে? ততক্ষণে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে থানায়। কিন্তু বাবাকে তো আর এসব বলতে পারি না, কিছু একটা বানিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেরি হয়ে গেল। বাবা তার আগেই লাফ দিয়ে উঠে খপ করে আমার চুল ধরে ফেললেন। এতো যত্ন করে এতোদিনে আমার চুল গুলোকে ঠিক করেছি, গঙ্গা নাপিতের এক ঘন্টা লাগে এটা দাড়া করতে, বাবা এক সেকেণ্ডে দিলেন এটার বারোটা বাজিয়ে। বাবা শুধু যে চুল ধরলেন তা না, ছোট লোকের মত চিৎকার করে বললেন, হারামজাদার বাচ্চা তুই আমার গরু তুলে দিয়েছিস তোর মিলিটারি বাবার হাতে, তোর জান আমি শেষ করব। তারপর কিছু বোঝার আগে আমার পেটে একটা লাথি। বিশ্বাস হতে চায় না, আমি তার একজন শিক্ষিত ছেলে—আমাকে তিনি এতোজন লোকের সামনে লাথি মেরে বসলেন? আমি নাক চেপে তখনই বসে পড়লাম, বাবা আবার তেড়ে আসছিলেন, সালাম চাচা কোনোমতে তাকে থামালেন। মনে হয় আমাকে মেরেই ফেলতেন। মানলাম সেটা তার হালের গরু কিন্তু আমি তো একটা মানুষ, আমার থেকে কি তার গরুই তার কাছে বেশি হল? আমার কপাল এতো খারাপ হল কেমন করে? কেন আমি এরকম একটা বাবা নিয়ে ফেঁসে গেলাম? খোদা, পৃথিবীতে কি বিচার বলে কিছু নাই?

মনে বড় দুঃখ হল, ইচ্ছে হল গলায় দড়ি দিয়ে জীবনটা শেষ করে দিই। একটা কাগজে লিখে যাই আমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমার বাবা। কিংবা আরো ভালো হয় যদি লিখে যাই আমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমার মূর্খ বাবা। কিন্তু কি লাভ? অশিক্ষিত বাবা না বুঝে সেই চিঠি ফেলে দিবেন আর দুনিয়ার কোনো মানুষ সত্যি কথাটা কোনো দিন জানতেও পারবে না! আমি পুকুর পাড়ে বসে বসে কয়টা লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আর আস্তে আস্তে সব রাগ গিয়ে পড়ল ঐ মিলিটারির উপর। এই জালিমের দল এসেই সব সর্বনাশ বাধিয়েছে। ইলেকশানে এতো ভোট পেয়ে শেখ সাহেব জিতেছেন তাকে ক্ষমতা না দিয়ে উল্টা এসব শুরু করেছে? এটা কি মগের মুল্লুক নাকি? কোঁচ দিয়ে একটা মিলিটারিকে গেঁথে ফেললে কেমন হয়? উচিত শিক্ষা হয়। তখন আমার হঠাৎ করে মুক্তিবাহিনীর কথা মনে পড়ল আর আমি ঠিক করে ফেললাম মুক্তিবাহিনীতে গিয়ে যোগ দেব। প্রচণ্ড যুদ্ধ করে সব মিলিটারি ধরে নিয়ে এই থানা দখল করে আমি বন্দুক নিয়ে এসে শালাদের গলার মাঝে ধরে বলব, আর খাবে আমার গরু? বাংলা তো বুঝবে না, উর্দুতে বলতে হবে, খায়গা আমার গরু? খায়গা?

আমার মনটা তখন একটু ভালো হল। উচিত শিক্ষা হবে শালাদের কিংবা কে জানে যুদ্ধ করতে করতে হয়তো আমিই মরে যাব, খবর পেয়ে বাবা প্রথমবার বুঝতে পারবেন তার ছেলে আসলে কত বড় দেশপ্রেমিক। কুলসুম হয়তো কাঁদতে কাঁদতে বলবে, কুদ্দুস ভাই, তুমি আমারে কার কাছে ছেড়ে গেলে? কার কাছে ছেড়ে গেলে ? আমি এখন কী নিয়ে থাকব? দৃশ্যটা কল্পনা করে আমার প্রায় চোখে পানি এসে গেল। লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি।

আর দেরি করে কাজ নেই। আজকেই রওয়ানা দিয়ে দিব। বিকেলের দিকে ভাটির দিকে গয়না নৌকা রওয়ানা দেয়, রাত পোহালেই বর্ডার। সেখানে এম.পি. সাহেব ক্যাম্প খুলেছেন, গিয়ে হাজির হলেই ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেন। মিলিটারি আসার আগেই গ্রামের অনেক ছেলেপুলে বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে। যাবার সময় আমাকে সাধাসাধি করেছিল, যাইনি। তখন চলে গেলেই পারতাম, এখন খামাখা এখানে পড়ে থেকে বাবার মার খাচ্ছি।

সবাইকে ছেড়ে ছুড়ে চলে যাব ভেবে একটু দুঃখ লাগল। দেশের ডাক বড় ডাক। না গিয়ে কী করি? শেখ সাহেব ঠিকই বলেছেন, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব কিন্তু এদেশেকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশা আল্লাহ। রক্ত দিয়ে জীবনটা শেষ করার আগে আরেকবার কুলসুমকে এক নজর দেখতে পারলে খারাপ হতো না। আমি সাত পাঁচ ভেবে ওদের বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। কয়দিন থেকে শুনেছি ওরা আরো পুবে চলে যাবে। মিলিটারির এতো কাছে থাকা ঠিক না, বাড়িতে কমবয়সী মেয়ে। কে জানে চলেই গেল কি না। আমি পকেট থেকে চিরুনিটা বের করে চুলটা আবার ঠিক করে

নিলাম। একটা আয়না থাকলে ভালো হতো। বাবা চুলের একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছেন এতো কষ্ট করে দাঁড়া করেছিলাম! শালা গঙ্গা নাপিত মিলিটারির ভয়ে ইন্ডিয়া ভেগে গেছে। এখন চুল ঠিক করব কিভাবে কে জানে।

কুলসুমদের বাড়ির সামনে দিয়ে দুবার হেঁটে গেলাম কিন্তু কোনো লাভ হল না। লাভ যে হবে সেরকম অবশ্যি আশাও করি নাই। গ্রামে পড়ে আছি, যত ইচ্ছেই থাকুক এখানে, একটি যুবতী মেয়ে তো আর বাইরে এসে আমার সাথে দেখা করতে পারে না। আমার কপালটাই খারাপ। আমরা তো একটা শহরেও থাকতে পারতাম তাহলে তো দেখা সাক্ষাত করে মনের কথা বলা যেতো। ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার খুব ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল, আর ঠিক তক্ষুণি আমি আফজালকে বের হয়ে আসতে দেখলাম। আফজাল কুলসুমের ছোট ভাই। শুধু এই কারণেই আমি এটাকে সহ্য করি। এছাড়া তাকে সহ্য করার কোনো কারণ নাই। এরকম বদমাইস ছেলে আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি। আমাকে দেখেই সবগুলো দাঁত বের করে আমার দিকে ছুটে এল। কুদ্দুস ভাই, চাচা নাকি আজকে লাথি মেরে আপনাকে একেবারে শুইয়ে দিয়েছে!

কষ্ট করে আমি রাগটাকে সামলে রাখলাম, বদমাইশ মানুষের সাথে রাগ করে লাভ নাই। বললাম মিলিটারি গরুটা ধরে নিয়ে গেছে, তাই বাবার মাথার ঠিক নাই।

কোনটা নিল?

লালটা।

আফজাল জিহ্বা দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বললো, কেমন করে নিল?

কেমন করে মানে? মিলিটারি কেমনে নেয় তুই জানিস না?

তা ঠিক।

মানুষের জানের ঠিক নাই আর গরু।

আফজাল আমার দিকে বাঁকা করে তাকিয়ে বলল, গরু তো অনেক কাজে আসে কুদ্দুস ভাই। মানুষেরা আর কি কাজে লাগে? এই ধরেন আপনার মতো একজন মানুষ!

কত বড় সাহস এই হারামজাদার, কুলসুমের মায়ের পেটের ভাই না হলে চড় মেরে এখনই দাঁতগুলো খুলে দিতাম না? আমি আফজালের কথা না শোনার ভান করে বললাম, মিলিটারি বেশি বাড় বেড়েছে, এখন সিধে হয়ে যাবে।

আফজাল ভুরু কুচকে বলল, কেমন করে?

মুক্তিবাহিনীর কথা শুনিস নাই?

আফজাল কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আসতেছে নাকি?

আমি এমনভাবে মাথা নাড়লাম যেন সব ভেতরের খবর জানি, আসতেছে না? বৃষ্টিটা আরেকটু নামতে দে। তারপর বুঝবি।

আপনি কেমন করে জানেন।

প্রশ্নটি কঠিন, তাই সোজাসোজি উত্তর না দিয়ে কথা ঘুরিয়ে ফেললাম, বললাম, আমিও যাচ্ছি।

কই?

মুক্তিবাহিনীতে।

আফজাল কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পেট চেপে ধরে হাসতে শুরু করল, এই খচ্চরটি হাসে খুব খারাপ ভাবে, বড় বড় দাঁত একেবারে মাড়ি পর্যন্ত বের হয়ে যায়। কুলসুমের মতো একটা ভালো মেয়ের এইরকম একটা বদমাইস ভাই কীভাবে বের হল কে জানে। কুলসুমের সাথে যদি সত্যিই একটা সম্পর্ক হয়ে যায় তখন এই বেটা হবে আমার ছোট শালা। চিন্তা করেই ঘাম ছুটে যায়।

আফজাল অনেক কষ্ট করে হাসি থামিয়ে আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, আপনি যাবেন মুক্তিবাহিনীতে? হা হা হা—আবার সেই বিকট হাসি।

আমি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললাম, কেন কী হয়েছে?

যখন ফাইটিং করতে যাবেন একটা বদনা নিয়ে যাবেন সাথে! হা হা হা।

চড় মেরে হারামজাদার দাঁত খুলে দেয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না করে আমি বাজারের দিকে রওনা দিলাম। বেটা বদমাইস আমার থেকে বয়সে কত ছোট কিন্তু কী ব্যবহার! শরীরটা বানিয়েছে শুয়ার মতো, একটা চড় মারলে উল্টো আমাকে মেরে বসে কিনা কে জানে। আসলে আফজালকে বলাই ভুল হয়েছে, এখন হি হি করে হেসে সবাইকে বলে বেড়াবে যেন কত একটা হাসির জিনিস। কে জানে হয়তো ভালোই হল, এখন কুলসুমও জানবে যে আমি মুক্তিবাহিনীতে যাচ্ছি। কুলসুম তো আর এটাকে হাসির জিনিস ভাববে না, জানবে যে আমি দেশের ডাকে নিজের জান দিয়ে দিতে পারি। সবার আগে আমার কাছে দেশের ইজ্জত।

আজকাল বাজারে গিয়ে কোনো শান্তি নাই। যখন তখন মিলিটারি এসে হাজির হয়, সামনে পিছু থাকে রাজাকারের দল। মিলিটারিগুলোর কী খান্দানী চেহারা কিন্তু স্বভাব বড় খারাপ। বাজারে এসে এক দোকান থেকে টান দিয়ে একটা জিনিস নিয়ে নেয়, আরেক দোকান থেকে টান দিয়ে আরেকটা জিনিস। যেন বাবার সম্পত্তি, কার ঘাড়ে দুইটা মাথা আছে যে আপত্তি করবে? শালারা মানুষ নয়, গত সপ্তাহেই মাছবাজারে গুলি করে তালেব আলীকে মেরে ফেলল। তালেব আলীর দোষ যে তার চুলগুলো লম্বা, মুক্তিবাহিনীর চুল নাকি লম্বা হয়! বেচারা তালেব আলী, বড় যাত্রা করার সখ ছিল, চুল লম্বা সে জন্যে, এতো সুন্দর বিবেকের পার্ট করত যে চোখে পানি এসে যেতো একেবারে।

বাজারে এসে আমি সুবলের দোকানে বসে মালাই দিয়ে চা খাই। সুবলও ইন্ডিয়া

ভেগে গেছে এখন দোকানটা পেয়েছে আজগর মিয়া। তার বাবা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, হিন্দুদের দোকানগুলো সেই ভাগাভাগি করে দিয়েছে। আজগর মিয়া অবশ্যি সবাইকে বলে বেড়ায় সে সুবল নাকি তাকে দোকান বিক্রি করে গেছে, সব কাগজপত্র নাকি তার কাছে আছে। মানুষজন যেন এতোই বোকা, নাক টিপলে যেন দুধ বের হয়! বেটা যে দালালদের দালাল সেটা যেন আর কেউ বোঝে না!

দোকানের ভেতরের দিকে বসে আমি একটা চায়ের অর্ডার দিলাম। আজকাল চা আর সে রকম ভালো হয় না তবু এসে বসি। একটা সিগারেট ধরাবো কি না ঠিক করতে পারছিলাম না তখন আজিজ মিয়া দোকানে এসে ঢুকলেন। এই পুরো এলাকায় একজন যদি সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ থাকেন তাহলে সেটা হচ্ছে আজিজ মিয়া। সেই যুগের ম্যাট্রিক পাস, আজকালকার বি.এ. এম. এ-কে পানি দিয়ে ধুয়ে খেয়ে ফেলতে পারেন। নতুন দাড়ি রেখেছেন, পাকা দাড়িতে চেহারায় একটা নূরানী ভাব চলে এসেছে। আজিজ মিয়ার মাথা এতো পরিষ্কার যে সেটা বলে বুঝানো যাবে না। গেল বছর সব মানুষপাগলের মতো শেখ সাহেবের নৌকায় ভোট দিল তখন আজিজ মিয়া মাথা নেড়ে বলেছিলেন কাজটা ভালো হল না। সত্যিই তাই হল, নৌকায় যদি একরকম ভোট না পড়ত তাহলে কি আর এই বিপদ হয়? তারপর যখন শেখ সাহেবের কথায় সবাই কাজকর্ম বন্ধ করে দিল আজিজ মিয়া মাথা নেড়ে বললেন, কাজটা ভালো হচ্ছে না, গজব নজদিক। শুধু যে বললেন তাই না, দাড়ি রাখা আরম্ভ করে দিলেন। এখন যখন মিলিটারি এসে থানায় ক্যাম্প করেছে এলাকার সবাই খাঁটি মুসলমান হয়ে গেছে। কিন্তু শুধু টুপি পড়লেই কি মুসলমান হওয়া যায়? খাঁটি মুসলমান হতে হলে দাড়ি লাগে। সবাই পাগলের মতো দাঁড়ি রাখা শুরু করেছে। কিন্তু দাঁড়ি তো আর ব্যাঙের ছাতা না যে একদিনে গজিয়ে যাবে। সব মাতব্বররা এখন খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ঠিক সময়ে শুরু করেছিলেন বলে আজিজ মিয়ার এর মাঝে পরিপাটি চাপ দাঁড়ি। দেখলেই ভক্তি এসে যায়, মিলিটারিরাও নাকি হাত তুলে সালাম দেয়।

আজিজ মিয়া আমাকে খুব স্নেহ করেন, তাই একলা বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন। আমি হাত তুলে সালাম দিলাম, কপাল ভাল সিগারেটটা ধরাই নাই, তাহলে এখন আস্ত সিগারেটটা ফেলে দিতে হতো। আজিজ মিয়া সামনে বসে বললেন, কুদ্দুস, তোমাদের গরু নাকি মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে?

জ্বী।

তোমার বাবা নাকি খুব মন খারাপ করেছেন?

জ্বী।

করতেই পারেন, আজিজ মিয়া মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, তোমাকেও নাকি মার-ধোর করেছেন?

আমি মাথা নিচু করলাম, কী শরমের কথা, দুনিয়ার সব মানুষই মনে হচ্ছে খবর

পেয়ে গেছে। আজিজ মিয়া একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এতো বড় মানুষের উপরে হাত তোলা ঠিক না। রোজ কেয়ামতের অবস্থা, মানুষজন মাথা ঠিক রাখবে কেমন করে!

আজিজ মিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার বাজারে ঘোরাঘুরি করা ঠিক না কুদ্দুস।

জ্বী চাচা। আমি আর আসব না। আজকেই শেষ। চলে যাচ্ছি আমি।

কই যাবা?

বর্ডার পার হয়ে যাব চাচা। মুক্তিবাহিনীতে চলে যাব। এই অত্যাচার আর সহ্য হয় না।

শুনে আফজাল যেভাবে হাসা শুরু করেছিল আজিজ মিয়া মোটেও তাই করলেন না। দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে গম্ভীর হয়ে বললেন, ঠিক বলেছ। দেশে গজব নেমেছে, এখন মাঝামাঝি থাকা যায় না। হয় এদিক না হয় সেদিক। চলে যাও তাড়াতাড়ি।

আজিজ মিয়ার মাথা খুব পরিষ্কার, আমি তাই উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চাচা আমি ঠিক জিনিষ করছি? কী বলেন আপনি?

আজিজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কুদ্দুস ব্যাপারটা খুবই জটিল। তুমি ঠিক কাজ করছ না কি ভুল করছ সেটা নির্ভর করে ভবিষ্যতে কি হবে তার উপর।

ভবিষতে কী হবে চাচা?

বলা কঠিন কুদ্দুস। বলা কঠিন।

তবু বলেন চাচা, কী মনে হয় আপনার?

আজিজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয় পাকিস্তান থাকবে।

পাকিস্তান থাকবে! কী বলছেন চাচা?

হ্যাঁ, পাকিস্তান থাকবে। কারণ পাকিস্তানের দিকে আছে আমেরিকা আর চীন। পাকিস্তানের বিপক্ষে হচ্ছে খালি ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া কি আর আমেরিকা আর চীনের সাথে টিকতে পারে? কী আছে ইন্ডিয়ার বলো? নিজের দেশের মানুষকেই খাওয়াতে পারে না।

কিন্তু চাচা দেশের মানুষতো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

চাচা হেসে বললেন, দেশের মানুষের কথা বাদ দাও কুদ্দুস। দেশের মানুষ হচ্ছে অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ। তাদের যেদিকে চালাবে সেদিকে চলব। দেশের মানুষ খালি একটা জিনিস বুঝে, সেটা হচ্ছে ডাণ্ডা। আজ সব শেখ সাহেবের দিকে, ডাণ্ডার বাড়ি দাও সব চলে আসবে পাকিস্তানের দিকে। বয়স তো আর কম হল না, মানুষ তো আর কম দেখলাম না এই জীবনে।

আজিজ মিয়ার কথা শুনে মনটা একটু খারাপই হল। বললাম, চাচা তাহলে কী যাব না মুক্তিবাহিনীতে?

দেখ তুমি বিবেচনা করে। তোমাদের বয়স কম, রক্ত গরম। মিলিটারির অত্যাচার দেখে তোমাদের মনে হয় এক্ষুণি মুক্তিবাহিনীতে যাই, দিই একটা শিক্ষা! ঠিক কি না?

জ্বী চাচা, ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু সেটা করা তো ঠিক না। সবকিছু ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করতে হয়। মিলিটারি অত্যাচারী সেটা ঠিক। কিন্তু সবসময় প্রথম এটা হয়। তারপর অত্যাচার কমে আসে, অবস্থা স্বাভাবিক হয়।

তাহলে কী বলেন চাচা, যাব না মুক্তিবাহিনীতে?

আজিজ মিয়া দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, আমার বিবেচনায় বলে যে তুমি রাজাকারে যোগ দাও।

রাজাকারে?

হ্যাঁ, তুমি শিক্ষিত মানুষ। রাজাকারে গেছে সব অশিক্ষিত মূর্খ লোক। তুমি জয়েন করলে দেখতে দেখতে প্রমোশন।

কিন্তু রাজাকার—

আজ তোমার গরু গেল, কাল ছাগল যাবে, পরশু ভিটা বাড়ি। আল্লাহ না করুক এর পরে তোমার বোনের দিকে নজর দিবে। কিন্তু যদি রাজাকারে যোগ দাও, তোমাদের কেউ ছুঁতেও পারবে না। কার বাবার সাহস হবে? তা ছাড়া মাসে মাসে বেতন। খাওয়া দাওয়া পোশাক অস্ত্রপাতি ফ্রি।

আমি চুপ করে একটু ভাবলাম, চাচার মাথা পরিষ্কার, একটা জিনিস ভুল বলেন নাই।

আর যদি মুক্তিবাহিনীতে যাও সাথে সাথে খবর চলে যাবে মিলিটারির কাছে, লোকজনের খাসলত খুব খারাপ কুদ্দুস। পরের দিন তোমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। এম.পি. সাহেবের বাড়ির কথা মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম, আওয়ামী লীগের এম. পি. ছিলেন সুলতান চৌধুরী, মিলিটারি এসে প্রথম দিনেই তার বাড়িটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মিলিটারি গরু নিয়েছে বলে বাবা আমার সাথে কি রকম ব্যবহার করেছেন, বাড়ি যদি পুড়িয়ে দেয় আমাকে একেবারে জবাই করে ফেলবেন না? বাবার অসাধ্য কোনো কাজ নাই।

আমি বললাম, বড় চিন্তায় ফেলে দিলেন চাচা।

আজিজ মিয়া গম্ভীর হয়ে বললেন, চিন্তার বিষয়ই তো এটা কুদ্দুস। খুব হিসাব করে কাজ করতে হবে, একটু যদি হিসাবে গোলমাল হয়—আজিজ মিয়া একটা হাতকে চাকুর মতো করে গলার উপর দিয়ে পোচ দিলেন। বুঝলে কুদ্দুস খুব হিসাব করে কাজ

করতে হবে। তবে আল্লাহর মর্জি আমার হিসাবে ভুল হয় না, এখনো হয় নাই। আমার মনে হয় পাকিস্তান জিন্দা আছে, জিন্দা থাকবে। বড় একটা ফাড়া এসেছিল, সেটা কেটে গেছে। আর ভয় নাই। মুক্তিবাহিনীর ঠুশ ঠাশ দুই চারটা গুলি দিয়ে মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করা যায় না। পাকিস্তান মিলিটারি বড় শক্ত জিনিস। আসল কথা তাদের ঈমান আছে, আমাদের মতো মুনাফেক না। তারা জানে পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামিক দেশ, এই দেশের জন্যে যুদ্ধ করা হচ্ছে জেহাদ, যদি জেহাদে মারা যায় তাহলে শহীদ, সোজা বেহেশতের দরজায়। কিন্তু যারা মুক্তিবাহিনীতে গেছে তারা যদি মারা যায় তাহলে কী শহীদের দরজা পাবে? পাবে না। কারণ তারা ইন্ডিয়ার জন্য কাজ করছে। ইন্ডিয়া হচ্ছে হিন্দুদের দেশ—হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থান চায় পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলতে, পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বড় ইসলামিক দেশটাকে ভেঙ্গে ফেলতে। সেটা তো ঠিক না।

আমি বড় চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমার কপাল ভালো যে আজিজ মিয়ার সাথে ব্যাপারটা আলোচনা করতে পারলাম, সবকিছু এতো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন যে কোনো কিছুতে আর সন্দেহ থাকে না। আজিজ মিয়া আরো খানিকক্ষণ কথা বলে এক কাপ চা খেয়ে উঠে গেলেন। যাবার সময় গলা নামিয়ে বলে গেলেন, যদি রাজাকারে যেতে না চাও যেও না। যদি মুক্তিবাহিনীতে যেতে চাও আল্লাহর উপর ভরসা করে চলে যাও। তবে দশজন মানুষকে ব্যাপারটা ভালো না, দিনকাল খুবই খারাপ।

অতি সত্যি কথা। আফজালকে বলা ঠিক হয় নাই, হারামজাদা এতোক্ষণে কত জায়গায় লাগিয়েছে কে জানে। তবে আজিজ মিয়ার কথা মতো যদি রাজাকারে যোগ দিয়ে দিই তাহলে কোনো ভয় নাই, কেউ আর আফজালের কথা বিশ্বাস করবে না। আমি চিন্তা করে দেখলাম যে আমার আসলে রাজাকারেই যাওয়া উচিত, দেশের বাড়িতে তাহলে একটা সম্মান নিয়ে থাকা যাবে। মিলিটারি আর আমাদের কাউকে অত্যাচার করবে না, বাবাও তাহলে আমার উপর খুশি থাকবে। ফ্রি খাওয়া জামা কাপড়। মাসে মাসে বেতন। বাবা কি কখনো হাত খরচের জন্যে একটা পয়সা দেন? তা ছাড়া রাজাকারে যোগ দিয়েছে সব অশিক্ষিত মূর্খ লোকজন, আমার মত শিক্ষিত একজন গেলে দেখতে দেখতে প্রমোশন। ভালো করে যদি কাজকর্ম করি তাহলে কে জানে হয়তো কোন একটা হিন্দুর দোকান আমার নামে লিখিয়ে নেয়া যাবে, তখন নিজের স্বাধীন ব্যবসা হবে, রইস উদ্দিনের মতো শ্বশুরের ব্যবসা না।

আমি চায়ের দাম দিয়ে বের হয়ে এলাম, বাজারে কাজেম আলীর ঘরে মাঝে মাঝেই রাজাকার কমান্ডার বসে, দেখা হলে একটু কথা বলে দেখা যাবে।

রাজাকার কমান্ডার মোহনগঞ্জের আসমত আলী। রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেবার কথা চিন্তা ভাবনা করছি শুনে আসমত আলী বড়ই খুশি হলেন। রাজাকার বাহিনীর ভবিষ্যৎ কত ভালো সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললেন। লোকজন এখনো ঠিকমতো

যোগ দিচ্ছে না এবং কত বড় একটা সুযোগ যে সবাই নষ্ট করছে সেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। রাজাকার ট্রেনিং যে সত্যি উঁচু দরের ট্রেনিং সেটা নিয়ে কথা বলে আমাকে ফিসফিস করে একটা ভেতরের খবর দিয়ে দিলেন, গণ্ডগোলটা একটু কমলেই নাকি রাজাকার বাহিনী থেকে মিলিটারিতে লোক নেয়া হবে, ট্রেনিংয়ের জন্যে তাদের পাঠাবে লাহোর! আসমত আলীর উৎসাহের শেষ নাই। আমাকে তখন টেনে নিয়ে গেলেন থানায়, ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখালেন, কোথায় অস্ত্রপাতি থাকে কোথায় গোলাবারুদ, কোথায় ওয়ারল্যাস মেশিন। নেংটি পরে মিলিটারিরা ব্যায়াম করছে দূর থেকে দেখলাম, আসমত আলীর সাথে আছি কোনো ভয় নাই। কিন্তু তবুও বুকটা ধুক ধুক করতে শুরু করল দেখে।

আসার সময় আসমত আলী খাতায় আমার নাম লিখে নিলেন। সব অশিক্ষিত মূর্খ লোক রাজাকারে যোগ দিয়েছে। কেউ নামসই পর্যন্ত করতে পারে না তাই টিপসই দিয়েছে। আমি একেবারে ইংরেজিতে নাম সই করে দিলাম। দেখে আসমত আলী মুগ্ধ হয়ে গেলেন, বললেন, বুঝলে কুদ্দুস, তোমার মতো শিক্ষিত মানুষই দরকার রাজাকার বাহিনীতে। অশিক্ষিত মূর্খ লোকেরা কিছু বোঝে না। তারা দেশ বুঝে না, যুদ্ধ বুঝে না, রাজনীতি বুঝে না, ইসলামও বুঝে না। বুঝে কী জানো? বুঝে কার গরু টেনে আনবে, কার বউ ধরে আনবে এই সব। লজ্জায় মরে যাই। এখন তুমি এসেছো, দশ জন দেখবে, রাজাকার বাহিনী এখন বুক উঁচু করে দাঁড়াবে।

বড় ভালো লাগলো আমার শুনে।

বাবা আমার কথা বুঝলেন বলে মনে হল না, বোকার মতো মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি আবার বললাম, বাবা আমি রাজাকারে যোগ দিয়েছি।

রাজাকারে?

জ্বী। আর ভয় নাই, তোমার গরুছাগল কেউ ধরবে না।

রাজাকারে?

মাসে দুইশো টাকা করে বেতন। খাওয়া ফ্রি, থাকা ফ্রি, কাপড় ফ্রি।

তুই রাজাকারে যোগ দিয়েছিস? বাবা হঠাৎ করে একেবারে যেন ফেটে পড়লেন, হারামজাদার বাচ্চা তুই রাজাকারে যোগ দিয়েছিস?

এইবার সাবধানে ছিলাম, বাবা অল্পের জন্যে চুলটা ধরতে পারলেন না।

হারামজাদা বলদ, বাজারে দড়ি ছিল না? তুই গলায় দড়ি পেলি না যে রাজাকারে যোগ দিলি?

আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, বাবা পাকিস্তান জিন্দা থাকবে, আমেরিকা আর চীন—

শূয়োরের বাচ্চা আমারে আমেরিকা চীন শিখাবি, আয় শিখা, আয়—বাবা হাত মুঠি করে

আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। আমি সাবধানে পিছে সরে গেলাম। বাবা আবার ফেটে পড়লেন, আয় হারামজাদা, জুতার বাড়ি দিয়ে যদি তোর চামড়া আমি না তুলি।

এতো দুঃখে আমার হাসি পেল। সারা জীবন কামলার মতো থাকলেন, জুতা কোনোদিন পরে দেখেছেন কিনা সন্দেহ। অথচ কথায় কথায় বলেন জুতার বাড়ি দিয়ে চামড়া তুলে নেবেন।

বের হ আমার বাড়ি থেকে, বের হ শূওরের বাচ্চা। আর যদি এই বাড়িতে কোনোদিন পা দিস, তোর পা ভেঙে আমি জন্মের মত লুলা করে দেব। শূয়োরের বাচ্চা বলদ, বের হ বাড়ি থেকে— বাবা কোথা থেকে একটা গরু মারার লাঠি তুলে লাফাতে লাগলেন। অন্য সময় হলে একটু বোঝানোর চেষ্টা করা যেতো, আজ আর কোনো আশা নাই। তাছাড়া বাবার চেচামেচি শুনে আমাদের ঘিরে একটা বেশ বড় ভিড় জমে উঠেছে, বাচ্চা ছেলেপিলেদের মনে হয় কোনো কাজকর্ম নাই। এর মাঝে বাবা যদি গরু মারার লাঠি দিয়ে মেরে বসেন লজ্জার ব্যাপার হবে।

আমি সাবধানে বের হয়ে এলাম। আসমত আলীর কথা শুনে মনটা বড় ভালো হয়েছিল সেটা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল। বড় খারাপ গালাগালি দেন বাবা, বলদ কেউ গালি দেয় মানুষকে? বাবা বলদ কথাটার মানে জানেন না?

কুলসুমের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখলাম পুরো বাড়ি খালি। গোয়াল ঘরের সামনে বসে শুধু একজন কামলা দড়ি পাকাচ্ছে। তার কাছে শুনলাম একটু আগে সবাই নাকি গরুর গাড়ি করে হিরণপুরে চলে গেছে। হিরণপুর এখান থেকে বারো-চৌদ্দ মাইল হবে। থানা থেকে বেশ দূরে। বাড়িতে কমবয়সী মেয়ে, থানার কাছে থাকা ঠিক না। তাছাড়া সাজলে গুজলে কুলসুমের চেহারা একেবারে সিনেমার নায়িকাদের মত, মিলিটারিরা একবার দেখলে বিপদ আছে। আমার একটু খারাপই লাগল, আমি তো এখন আছি রাজাকার বাহিনীতে, আর কী ভয় ছিল কুলসুমের?

থানায় রাতের খাওয়াটা হল বড় ভালো। মিলিটারির জন্যে আলাদা বাবুর্চি, রাঁধে খুব ভালো। ভাত রাঁধতে পারে না বলে পোলাও রেঁধে রেখেছে। সাথে ভুনা গরুর গোশত। গোশত মুখে দিলে মাখনের মতো গলে যায়, নিশ্চয়ই বাবার আদরের গরুটা, সাহস করে আর জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

সন্ধ্যা হতেই থানার চারদিকে কারফিউ দেয়া হয়। আশেপাশে গাছপালা সব কেটে ফেলা হয়েছে, বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। থানার উপর বালুর বস্তা দিয়ে মেশিন গান রাখার জায়গা করা হয়েছে। চারকোণায় চারটা বাংকার, বালুর বস্তা দিয়ে ঢাকা, মিলিটারির কাজ কারবার দেখলে তাক লেগে যায়। এমনিতে পুরো থানা তারকাঁটা দিয়ে

ঘেরা, কার বাবার সাধ্যি আছে কাছে আসে? অন্ধকার হতেই রাজাকার বাহিনীর কাজ শুরু হয়, দুইজন দুইজন করে বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পাহারায় বের হয়ে যায়, কাউকে দেখলে গুলি করার হুকুম আছে। আমার ট্রেনিং হয় নাই, তাই আজ রাতে কোনো কাজ নাই। কাল সকাল থেকে ট্রেনিং শুরু হবে, শক্ত ট্রেনিং, আসমত আলী বলেছেন— মিলিটারি ট্রেনিং থেকে কোনো অংশে কম না। আজকে তাই সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম। বাবার যন্ত্রণায় বিছানাপত্র কিছুই আনতে পারি নাই, কিন্তু অসুবিধে হল না। আসমত আলী বিছানার ব্যবস্থা করে দিলেন, সবার জন্যে নিচে টানা বিছানা, আমারটা একটু আলাদা। শিক্ষিত মানুষ বলে আসমত আলী আমাকে একটা মশারিও দিলেন। মশারির কোণায় কোণায় পুরুষ্টু ছারপোকা, ঘুমানোর আগে সব টিপে টিপে মারলাম।

একটু রাত হলেই গান বাজনার আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো, গজল আর উর্দু গান। মিলিটারিদের চেহারা খান্দানি, গানবাজনা গুলীও সেরকম খান্দানি, শুনে একবারে নেশার মতো হয়ে যায়। অপরিচিত জায়গায় সহজে ঘুম আসতে চাচ্ছিল না। তাছাড়া কয়েকটা মশা বড় জ্বালাতন করছিল, রক্ত খেয়ে সরে যা, তা না করে কানের কাছে ভোঁ ভোঁ। আমি বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখলাম আমি বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ কোথা থেকে জানি কুলসুম এসে হাজির হল। কুলসুমের ঠোঁটে লিপিস্টিক। আমি কুলসুমকে বললাম, কুলসুম তুমি হিরণপুরে চলে গেলে? তোমার তো এখন কোনো ভয় নাই, আমি আছি। কুলসুম বলল কিন্তু আমি আপনার কাছে কেমন করে আসব, আপনার গায়ে তো কাপড় নাই। আমি তাকিয়ে দেখি সত্যি আমার গায়ে কোনো কাপড় নাই, পুরা ন্যাংটা, আমি তখন একটা দৌড় দিলাম সামনে, আর পিছে পিছে সব লোক চিৎকার করে ছুটে আসতে শুরু করল। যেদিক যাই লোকজন পিছনে পিছনে আসে! মহা মুশকিলের ব্যাপার, কী বাজে একটা স্বপ্ন—কতক্ষণ এই বাজে স্বপ্নটা দেখতে হতো কে জানে। কিন্তু তখন আসমত আলী আমাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে দিলেন। আমি ধরমর করে উঠে বললাম, কী হয়েছে আসমত ভাই? মুক্তিবাহিনী এসে গেছে নাকি?

আরে না মুক্তিবাহিনী আসে নাই। শালাদের এতো সাহস হবে না।

তাহলে?

ডিউটি আছে।

ডিউটি? আমার যে এখনো ট্রেনিং হয় নাই আসমত ভাই।

আরে আস তো। তোমার যে ডিউটি তাতে ট্রেনিং লাগবে না। আসমত আলী চাপা গলায় হাসলেন।

আসমত আলী তার বন্দুকটা নিয়ে বের হলেন, আমি শার্টটা পরে তার পিছনে পিছনে বের হলাম। বাইরে অন্ধকার, তবে আকাশে বড় চাঁদ উঠেছে তাতে ঝাপসা

ঝাপসা দেখা যায়। আমি বললাম, আসমত ভাই, আপনার বন্দুকটা একটু ধরে দেখি?

আসমত ভাই সাবধানে আমার হাতে দিয়ে বললেন, নেও দেখ। এটারে বন্দুক বলে না, এটারে বলে রাইফেল, অনেক কিসিমের অস্ত্রপাতি আছে, একেকটার একেক নাম। কোনোটারে বলে রাইফেল। কোনোটারে বলে মেশিনগান। আস্তে আস্তে সব শিখবে তুমি।

আমি রাইফেলটা হাতে নিলাম। কি ওজনদার জিনিস, হাতে নিলেই বুকের ভেতরে অন্যরকম একটা ভাব হয়। এই জিনিসটা হাতে নিয়ে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। এতো বড় একটা মুসলমানদের দেশ, ভেঙে ফেলবে মানে? ফাজলেমি নাকি?

আসমত ভাই রাইফেলটা ফেরত নিয়ে বললেন, হল কুদ্দুস।

কই?

আসো তো আমার সাথে। আসমত আলী টর্চের আলো ফেলে হাঁটতে হাঁটতে আবার চাপা গলায় হাসলেন, কিছু একটা ব্যাপার আছে মনে হয়।

থানার পিছন দিকে চালাঘরে রান্না হয়, সেখানে একটা গামলায় ভাত, তার উপরে কিছু ডাল তরকারি। আসমত আলী বললেন, নাও এটা।

আমি সাবধানে তুলে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কার খাবার এগুলো?

চলো আমার সাথে দেখাব।

টর্চের আলো ফেলে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, মিলিটারি স্যারদের কাজ কারবারই অন্যরকম।

কেন আসমত ভাই?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, জোয়ান মরদ একেকজন, বউ পরিবার দেশে রেখে এসেছে। শরীরের তো একটা দাবি আছে কী বলো?

আমি টের পেলাম, আমার কানের কাছে একটু গরম হয়ে উঠল, কোনোমতে ঢোক গিলে বললাম, হুঁ।

শরীয়তে আছে জেহাদ করে দেশ দখল করলে, ধনসম্পত্তি মানুষ মেয়েমানুষ সব গণিমতের মাল। গণিমতের মাল ভোগ করা জায়েজ আছে, গুনাহ হয় না। বুঝেছো?

জ্বী।

বিরইপুরের পীরসাবকে আমি নিজে জিজ্ঞেস করেছি, পীরসাব বলেছেন, জায়েজ আছে।

জ্বী।

দেশটাতে হিন্দুস্থান নিয়েই নিয়েছিলে, মিলিটারি স্যারেরা এসে কোনোমতে রক্ষা করেছেন। পুরো দেশটাই তো বলতে গেলে এখন তাদের গণিমতের মাল, কী বলো?

জ্বী।

মিলিটারি স্যারেরা তাই গণিমতের মাল দিয়ে একটা হেরেম খুলেছেন।

হেরেম? আমি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, হেরেম কি, আসমত ভাই?

চলো চলো দেখাব, সে জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছি। রাজা বাদশাহদের হেরেম থাকে জানো না? সুন্দর সুন্দর মেয়ে মানুষ আসত নিয়ে পৃথিবী খুঁজে। পাহারা দিত খোজারা।

খোজা?

হ্যাঁ।

খোজা মানে কী?

খোজা মানে হচ্ছে বলদ। পুরুষ মানুষকে খাসি করলে সেটাকে বলে খোজা। হা হা হা—রাজা-বাদশাহদের বুদ্ধি দেখ!

আমি কিছু না বলে পিছু পিছু হাঁটতে থাকলাম, টের পাচ্ছি, আস্তে আস্তে কানটা গরম হয়ে যাচ্ছে।

আসমত আলী বললেন, মিলিটারিরা আজ গিয়েছিল হিরণপুর। আরেকটা মেয়ে ধরে এনেছে। এখনো দেখি নাই। ভালো জিনিস না হলে স্যারেরা সাথে নিয়ে আসেন না, কাজকর্ম শেষ করে ওখানেই ফেলে রাখেন।

হিরণপুর? আমার মাথা ঘুরে উঠল? কুলসুমরা হিরণপুরে গিয়েছে না, কী সর্বনাশ!

আসমত আলী একটা ছোট ঘরের সামনে থামলেন। কোমরে ঝুলানো চাবি দিয়ে তালা খুলে আসমত আলী ভেতরে ঢুকে টর্চের আলো ফেললেন। ঘরের এককোণায় আট নয়জন মেয়ে মানুষ গুটি শুটি মেরে বসে আছে, দেখে বোঝাই যায় না মানুষ। আমার বুক ধুক ধুক শব্দ করতে শুরু করল। কুলসুম কী আছে ওদের ভেতর? আছে কী?

আসমত আলী ওদের উপর টর্চের আলো ফেললেন, তারপর গলা নামিয়ে বললেন, ঐ যে ডান দিকেরটা নতুন। আজকে এনেছে, কি জিনিস দেখেছ?

মেয়েটা মাথা ঢেকে রেখেছে, টর্চের আলোতে ভালো দেখা যাচ্ছে না। কুলসুম নাকি ঐ মেয়েটা? কুলসুম নাকি?

আসমত আলী ফিসফিস্ করে বললেন, মাগী মালাউন। কপালে সিঁদুর দিয়েছে।

আমার জান ফিরে এল, উহ্! কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম। যদি কুলসুম হতো কী সর্বনাশ না হতো। উহ্! খোদা মেহেরবান, তুমি কি বাঁচানোটাই বাঁচিয়েছ। আমি লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে মেয়েগুলোর দিকে ভালো করে তাকালাম, এমনভাবে বসেছে যে শরীরের কিছু দেখা যায় না। ভালো করে তাকিয়ে আমি একবারে চমকে উঠলাম। কারো গায়ে দেখি কোনো কাপড় নাই! কুলসুমের চিন্তায় এতোক্ষণ ভালো করে তাকাতেই পারছিলাম না। কী আশ্চর্য! হেরেম কী একরম হয় নাকি? আসমত আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আসমত ভাই কারো গায়ে কোনো কাপড় নাই কেন?

আর বলো না, মাগী মানুষের বুদ্ধি। শাড়ি প্যাচিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে দেয়। দুইটা মরেছে এভাবে। এখন বুদ্ধি ভালো বের হয়েছে, দেখি গলায় দড়ি কি দিয়ে দেবে! হে হে হে! কুদ্দুস ভাতের গামলাটা রেখে দাও। খামাখা খাবার দেয়া হয়, মাগীরা কিছু খায় টায় না।

আমি গামলাটা নিচে রাখলাম। আসমত আলী তখন আরেকটু এগিয়ে গেলেন। টর্চের আলো ফেললেন মেয়েদের শরীরে। মেয়েগুলো তখন আরো গুটিয়ে গেল নিজেদের ভেতরে। আসমত আলী খানিকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার কাছে এসে গলা নামিয়ে বললেন, কুদ্দুস, তুমি আমার রাইফেলটা হাতে নিয়ে একটু বাইরে দাঁড়াবে? খবরদার কাউকে ঢুকতে দিবে না।

জ্বী, আচ্ছা।

আসমত আলী মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, কাউকে বলো না, বুঝলে। তোমাকেও চান্স দেব মাঝে মাঝে। হে হে হে।

জ্বী।

আমি বের হয়ে এসে আস্তে আস্তে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসলাম। শরীরটা অবশ অবশ লাগছে। তবে রাইফেল জিনিসটার একটা যাদু আছে, হাতে নিলেই একটা অন্য রকম ভাব হয়। এটা হাতে নিয়ে হঠাৎ একটা আশ্চর্য জিনিস করার ইচ্ছে হল। ইচ্ছে করল রাইফেলটা নিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকি তারপর গুলি করে আসমত আলীর খুলিটা বের করে দেই। খুলিটা বের করে মেয়েগুলোকে বলি, যাও তোমরা বাড়ি যাও। চিন্তাটা বড় আজগুবি, তাড়াতাড়ি মাথা থেকে সরিয়ে দিলাম। এটা চিন্তা করা একেবারেই ঠিক না। কারণ আমি রাইফেল দিয়ে কীভাবে গুলি করতে হয় সেটাও জানি না, আর গুলি যদি করেও ফেলি সব মিলিটারিরা ছুটে আসবে না? তখন? তাছাড়া মেয়েদের গায়ে কোনো কাপড় নাই, তারা বাইরে যাবে কেমন করে? শুধু শুধু একটা জিনিস ভাবলেই তো হয় না, সেটার তো সম্ভব অসম্ভবেরও একটা ব্যাপার আছে? এরকম একটা আজগুবি চিন্তা মাথায় হাজির হল কেন কে জানে। আসমত ভাই বিশ্বাস করে আমাকে রাইফেলটা দিয়েছেন আর আমি কিনা তাকে গুলি করার কথা চিন্তা করছি, কত বড় একটা গুনাহের কাজ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আমার এখন অনেক দায়িত্ব। এইরকম উল্টা পাল্টা চিন্তা মাথায় জায়গা দেয়া ঠিক না।

রাইফেলটার গায়ে হাত বুলালাম, কালকে আমাকেও এরকম একটা রাইফেল দিবে। এই রাইফেল দিয়েই আমরা পাকিস্তানকে রক্ষা করব, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইসলামিক দেশ, দেখি কোন্ শালা এর উপর হাত দেয়।

ঘরের ভেতর থেকে হঠাৎ একটা কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। মাগী কাঁদে কেন? কি যন্ত্রণা?

ইরা নামের হরিণ

ইরা নামে আমাদের একটা হরিণ ছিল। সুন্দরবনের চিত্রল হরিণ। প্রথম যখন তাকে আনা হয় তখন সে ছিল একেবারে ন্যাদা ন্যাদা বাচ্চা। এতো ছোট যে তাকে বোতলে করে দুধ খাওয়াতে হতো। ছোট বাচ্চাদের মতো সে বেশ চুক চুক করে দুধ খেত। সব হরিণেরই কাজল টানা চোখ হয়, তারও তাই ছিল, কিন্তু আমরা সে চোখ দেখে ধরে নিয়েছিলাম সে হচ্ছে মেয়ে হরিণ, আমার বড় ভাই তাই আদর করে তার নাম রাখলো 'ইরা'। পরে আবিষ্কার করা হল সেটি ছেলে হরিণ, কিন্তু ততোদিনে আমাদের ইরা নামটির উপর মায়া পড়ে গেছে তাই সেই ছেলে হরিণটি একটি মেয়ের নাম নিয়েই বড় হতে থাকল, তার নিজের যখন কোনো আপত্তি নেই আমরা কেন আপত্তি করব? কোথায় জানি পড়েছিলাম হরিণ বুনো প্রাণী, সহজে পোষ মানে না। কথাটা সত্যি, ইরা কখনোই ঠিক পোষ মানে নি। তাকে আমরা নানারকম খোশামুদি করতাম। তবু সে নিজের থেকে আমাদের কাছে বড় একটা আসতো না, দূর থেকে গলা উঁচু করে সন্দেহের চোখে দেখতো। সেটি আমাদের কাছে আসত শুধু সন্ধে বেলায়, তাও রোজ নয়, যেদিন বাসার ভেতরের খোলা বারান্দায় সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতাম এবং আমার বোন হারমোনিয়াম নিয়ে রবীন্দ্র সংগীত গাইত, সেদিন। সম্ভবত হরিণেরা রবীন্দ্র সংগীত পছন্দ করে! আমার বাবার গলায় সুর বিশেষ ছিল না কিন্তু প্রবল উৎসাহ ছিল, তিনি বোনের সাথে প্রাণপণে গান গাওয়ার চেষ্টা করে যেতেন, সহজ একটা গান বেছে নিলেই হতো কিন্তু বেছে নিতেন এমন একটা গান যেখানে গলার কারু কাজ তাল লয়ের মুন্সিয়ানা থাকতে হয়। বাইরে প্রবল প্রতাপশালী এই মানুষটি ঘরে বিশেষ ছেলেমানুষ ছিলেন, আমরা অনেক দিন থেকে সেটা জানি, তাই তার বেসুরো গান শুনেও আমরা তাকে উৎসাহ দিয়ে যেতাম। হরিণটি গানের সুরেই হোক আর সবাইকে দেখেই হোক, পায়ে পায়ে আমাদের কাছে এগিয়ে আসতো, কোনো একজনের কাছে এসে তার গলাটি লম্বা করে

দাঁড়িয়ে থাকতো। এতোদিনে তার ভাবভঙ্গি আমরা বুঝতে শিখেছি, গলা লম্বা করে দাঁড়ানো মানে তার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিতে হবে। আমরা তখন পালা করে তার গলায় হাত বুলিয়ে দিতাম এবং সেও একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে এগিয়ে যেত। সন্ধের পর নামায পড়ে আমাদের মা চা নিয়ে আসতেন, বসে বসে চা খেতে খেতে সন্ধে গড়িয়ে রাত করে দেয়া হতো কারো আর উঠতে ইচ্ছা করতো না। আমরা ভাইয়েরা তখনো সিগারেট খাওয়া শিখিনি। তাই ছুতো করে উঠে যাওয়ার দরকারও হতো না। দৃশ্যটি মনে হতো বিভূতিভূষণের একটা উপন্যাস থেকে উঠে এসেছে। আমি বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে এই দৃশ্যটি প্রায় চেখে চেখে দেখতাম, মনে হত যেন কুয়াশার মত স্বচ্ছ কোমল একটা সুখ এই দৃশ্যটি থেকে ভেসে ভেসে আসছে!

ঠিক এরকম সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর একদিন পাকিস্তানি মিলিটারির লোকেরা আমার বাবাকে গুলি করে মেরে ফেলল।

আমাদের বয়স তখন খুব বেশি নয়। খুব যে ছোট তাও নয়, এ বয়সে অনেক মানুষ বেশ খেটে খুটে সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকে। আমরা অবিশ্যি খুব কাজের মানুষ না। বোনটা চমৎকার রবীন্দ্র সংগীত গায়, ছোট ভাই ভালো ছবি আঁকে—একটানে রবীন্দ্রনাথ এঁকে ফেলতে পারে, বড় ভাই প্রায় বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিতা লেখে, আমার উৎসাহ যন্ত্রপাতিতে—রেকর্ড প্লেয়ার নষ্ট হলে চোখের পলকে সেরে ফেলি। কিন্তু বাবাকে গুলি করে মেরে ফেলে আমাদের রাতারাতি পথে নামিয়ে দেবার পর এই গুণাবলি বিশেষ কোনো কাজে আসে না। মিলিটারির ভয়ে আমরা একটা অচেনা গ্রামে একজন অপরিচিত মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি মানুষটি গ্রামের বড় মাতব্বর, পয়সাকড়ি আছে। বাবা বড় অফিসার, তাই আমাদের বেশ খাতির যত্ন করছিল। কিন্তু বাবাকে মিলিটারি মেরে ফেলেছে খবর পেয়ে আমাদের মাতব্বর ভদ্রলোক কেমন জানি ঘাবড়ে গেলেন। দীর্ঘ সময় চিন্তা ভাবনা করে সন্ধেবেলা আমার মাকে বললেন, মা কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি।

বলেন।

আপনার সাহেবকে মিলিটারি মেরে ফেলেছে, খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু—

কিন্তু কী?

আমরা জানি সাহেব লোক ভালো ছিলেন, কিন্তু—

কিন্তু কী?

মিলিটারিরা যদি জানে আমি আপনাদের জায়গা দিয়েছি তারা এসে আমার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবে।

মাতব্বর কি বলতে চাইছে মা বুঝতে পারলেন, কিন্তু না বোঝার ভান করলেন।

মাতব্বর হাল ছেড়ে দিল না, বলল, ছেলেমেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকি। বাড়িঘর পুড়িয়ে দিলে তো বড় সমস্যা।

মা বললেন, কী করব আমি?

আপনি আপনার ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য কোথাও যান।

মা বললেন, কোথায় যাব আমি? আমি এখানে কাউকে চিনি না।

তা ঠিক। কিন্তু আমারও তো বেঁচে থাকতে হবে। আপনার জন্যে আমার বাড়িঘর, পরিবার পরিজন—

মা বললেন, ঠিক আছে আমি যাব। ভোর হলেই খোঁজ খবর নিয়ে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে যাব।

মাতব্বর বললেন, ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন? এখনই যেতে পারেন না?

এখনই?

মাতব্বর মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ।

মা বললেন, এই সন্ধে বেলা? আমরা এই এলাকার মানুষ না। আমি এখনকার কাউকে চিনি না, জানি না—

মাতব্বর মায়ের চোখের দিকে তাকালেন না, বলল মিলিটারি আপনাদের খোঁজ করছে, আমি খবর পেয়েছি।

আমার মা স্থির চোখে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই সন্ধেবেলায় আমার একজন অতি সাধারণ নিরীহ মা পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারণ মানুষে পাল্টে গেলেন। তার বুকে জন্ম নিল সিংহীর সাহস, তার স্নায়ুতে হাজির হল ইস্পাতের দৃঢ়তা, তার মস্তিষ্কে এল শতবর্ষী তপস্বীর ধী শক্তি, বুকে বানের মতো ফুলে ফেঁপে উঠল সন্তানদের জন্যে ভালোবাসা। মাতব্বরের দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, আপনার ভয় নেই। আমি আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে এখনই চলে যাব।

ভর সন্ধেবেলা একটা নৌকা ছেড়ে মাঝি জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব গো মা?

আমার মা কিছু না বলে চুপ করে পাথরের মতো বসে রইলেন। কী বলবেন—মা তো নিজেও জানেন না কোথায় যাবেন। ভয়াবহ একাত্তর তখন চারদিকে মৃত্যু হাত পেতে আছে, নদীর কালো পানির দিকে ভালো করে তাকালে একটি দুটি মৃতদেহকে ভেসে যেতে দেখা যায়, তার মাঝে সদ্য স্বামীহারা একজন জননী তার সন্তানদের বুকে আগলে ছোট একটা নৌকায় অনিশ্চিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোথায় যাবে জানে না, এর থেকে মর্মান্তিক দৃশ্য আর কী হতে পারে? আমরা নৌকায় বসে আকাশের দিকে তাকালাম, নদীর তীরে গ্রামের দিকে তাকালাম, দেখতে দেখতে আমাদের সবার কেমন জানি বয়স বেড়ে গেল।

হঠাৎ দেখলাম নদীর তীর থেকে একজন মানুষ হাত নেড়ে আমাদের ডাকছে। মা বললেন, মাঝি নৌকা ভিড়াও।

আমার ভাই লোকটিকে চিনতে পারে। যে বাড়ি থেকে আমাদের বের করে দিয়েছে সে বাড়ির প্রাইভেট টিউটর, বাচ্চাদের পড়ায়। এরকম অবস্থায় এভাবে বের করে দেয়াটা বেচারাকে খুব কষ্ট দিয়েছে, তখন কিছু বলেনি। বলার কিছু নেই, বড় ধরনের বিপদে মানুষের আসল রূপটা বের হয়ে পড়ে। প্রাইভেট টিউটর লোকটি তার বাড়িতে আমাদের আশ্রয় দিতে চায়। অন্ধকার হলে গোপনে তার বাড়িতে উঠে গেলে জানাজানি হওয়ার ভয় নেই। আমার মা রাজি হলেন। সন্ধে ঘনিয়ে গেলে ঘাটে নৌকা বেঁধে আমরা ধানক্ষেতের পানির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে তার বাড়িতে গেলাম। সেদিন পূর্ণিমার রাত, আকাশে ভরা কলসির মতো মস্ত একটা চাঁদ উঠেছে, সন্ধেবেলা নদীর পানিতে তার পূর্ণ প্রতিফলন পড়েছে, পুরো ব্যাপারটিতে কেমন জানি একটি অশরীরী সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। এই অলৌকিক সৌন্দর্য দেখার মতো আমাদের কারো মনের অবস্থা নেই। কিন্তু প্রকৃতি যেন লজ্জাহীনার মতো তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে সেই সন্ধেবেলায় আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা দেখব না দেখব না করে হা করে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমার বাবাকে গুলি করেছিল নদীর ঘাটে। নদীর ঘাটে গুলি করে মারার অনেক সুবিধে, মৃতদেহ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না, নদী বুক পেতে নিয়ে নেয়। আমার বাবার শরীরও নদী বুক পেতে নিয়ে নিল। জোয়ারের সময় নদী তার শরীরকে নিয়ে গেল উত্তরে, ভাটির সময় আবার ফিরিয়ে আনল দক্ষিণে। গ্রামের মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তিনদিন পর তার শরীর এসে লাগলো নদী ঘাটে। গ্রামের মানুষ বলল, আহা এরকম একটা মানুষ, মাটি পাবে না সেটা কি করে হয়?

আমরা যখন জোছনার আলোতে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি ঠিক তখন কিছু মানুষ সেই একই জোছনার আলোতে আমার বাবাকে নদী থেকে তুলে এনে এক নির্জন নদীতীরে কবর দিয়ে দিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় কত লক্ষ মানুষকেই না মারা হয়েছে, কয়জনের কপালে এক টুকরো মাটি জুটেছিল?

হত দরিদ্র প্রাইভেট টিউটর তার বাড়ি আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। দুঃখ কষ্টের অনুভূতি ঠিক নেই, কেমন যেন একটা ভয়ের দুঃস্বপ্নের মতো সময় কেটে যাচ্ছে। রাতে টিমটিমে একটা কুপি বাতির আলোতে সবাই বসে আছি, হঠাৎ দেখি অন্ধকারের আড়ালে সেই প্রাইভেট টিউটর চুপি চুপি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বোঝার আগে লোকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। মা ফিসফিস্ করে বললেন, এই লোক

কোথায় যায়? কোথায় যায় এই লোক?

আমরা কিছু উত্তর দিলাম না।

মা বললেন, বাতি নিভিয়ে দে।

আমরা বাতি নিভিয়ে দিলাম।

মা বললেন, ঘুমাবি না কেউ খবরদার। কী বিপদ হয় কে জানে।

আমরা উত্তর দিলাম না। গত কয়েকদিন কেউ কী ঘুমিয়েছে?

মানুষটি কে, কী করে কিছুই আমরা জানি না। বিপদের সময় আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে তার বাড়িতে তুলে এনেছে। এখন কী সে-ই মোটা বকশিসের জন্যে মিলিটারিকে খোঁজ দিতে যাচ্ছে। নাকি এই লোকের অন্য উদ্দেশ্য আছে যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না? আমরা নিঃশ্বাস আটকে একটা আতংকের মাঝে বসে রইলাম। খুট করে একটা শব্দ হলেই সবাই চমকে উঠি। ঘন্টা খানেক পরে কে একজন চুপি চুপি ফিরে এল, মা গলা উঁচিয়ে বললেন, কে? কে যায়?

আমি মা। প্রাইভেট টিউটর ভিজে জব জবে। হাতে একটা জাল, কোমরে বাঁধা মাছের চুপড়ি। গামছা দিয়ে মাথা নিংড়ে বলল, বাচ্চারা কি ঘুমিয়ে গেছে?

না বাবা। কোথায় গিয়েছিলে এতো রাত্রে?

প্রাইভেট টিউটর ইতস্তত করে বলল, আপনাদের যে খেতে দেব বাসায় সেরকম কোনো খাবার নেই মা। তাই ভাবলাম নদীতে জালটা ফেলে দেখি কিছু মাছ ধরতে পারি কী না। মাছগুলো কেটে বসিয়ে নিচ্ছি, সাথে চারটি ভাত ফুটিয়ে নিলে কিছু একটা মুখে দিতে পারবেন।

আমার চোখে পানি এসে গেল, অন্ধকারে কেউ দেখতে পেল না। সাবধানে মুছে ফেললাম। মনে মনে বললাম, হে খোদা, যদি বেঁচে থাকি এই তোমাকে বলে রাখলাম, জীবনে আর কোনো দিন কোনো মানুষকে অবিশ্বাস করব না!

প্রাইভেট টিউটরের বাসায় কয়েকদিন থেকে আমরা চলে এলাম একজন সদালাপী সহৃদয় ধর্মভিরু মানুষের বাসায়। ধর্মভিরু মানুষকে মোটামুটি দুইভাবে ভাগ করা যায়। একভাগের ধারণা পৃথিবীটা জঘন্য জায়গা, চারদিকে শুধু পাপ আর পাপ, অন্য ভাগের ধারণা পৃথিবীটা একটা চমৎকার জায়গা, চারদিকে শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়। আমরা যার বাসায় আশ্রয় নিলাম তিনি দ্বিতীয় দলের মানুষ। যেটাই দেখেন সেটাতেই তিনি ছেলেমানুষের মতো অবাক হন। আমাদের আশ্রয় দেয়ায় মিলিটারিরা তার বাড়ি পুড়িয়ে দেবে বলে যারা তাকে সাবধান করতে এল তিনি মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে তাদের দৌড়িয়ে দিলেন। তার আবার দুই স্ত্রী। ছোট বাসায় আমাদের সামনে লম্বা ঘোমটা দিয়ে তাদের হাঁটাহাঁটি করতে হয় বলে তিনি একদিন ফতোয়া দিলেন, মিলিটারির অত্যাচার হাশরের ময়দানে আজাবের মতো ভয়ংকর, হাশরের ময়দানে যে রকম পর্দা করতে হবে

না এখনো সেরকম পর্দা করতে হবে না।

ফতোয়া শুনে তার বউ দুজন মহাখুশি, ঘোমটা খোলার পর দেখতে পেলাম মিষ্টি চেহারার কমবয়সী দুটি মেয়ে। দুজনের খুব ভাব, দিনরাত গল্পগুজব করছে, দুজনেরই বাচ্চা কাচ্চা রয়েছে। বাচ্চাদের বাড়তি সুবিধে, এক মা যখন পিটুনি দিতে তাড়া করে আসে তখন অন্য মায়ের কাছে আশ্রয় নেয়, মোটেও রূপকথার সৎমায়েদের মতো নয়।

এ জায়গায় আমরা বেশ কিছুদিন থাকলাম। এর আগে কখনো এত দীর্ঘদিন গ্রামে থাকিনি কিন্তু বেশ অভ্যাস হয়ে গেল, দুটি জিনিস ছাড়া, তার একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক কার্য কলাপের ব্যাপারটি যাকে আমরা ভদ্রভাষায় বলি 'বাথরুম'। তার জন্যে খালের পাশে যে জায়গাটা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে সেখানে কিছু নেই শুধু একটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে রাখা আছে। খুঁটিটা শক্ত করে ধরে না রাখলে খালে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। ধরে রেখেও খুব সুবিধে হয় না। কারণ জায়গাটি ভীষণ পিছলে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে যে এই জায়গাটির কোনো দরজা নেই এবং শুনেছি ছোট বাচ্চারা খেলতে খেলতে প্রায় ভেতরে ছুটে আসে। বড়দের মতো লজ্জা পেয়ে বের হয়ে যায় না, সেই অবস্থাতেই কোনো একটা বিষয়ে গল্প জুড়ে দেবার চেষ্টা করে।

এই গ্রামের যে দ্বিতীয় জিনিসটিতে শেষ পর্যন্ত অভ্যস্ত হতে পারলাম না সেটা হচ্ছে জ্বিন। সবসময় জ্বিন ভূতের ব্যাপার মানুষজন একটু আতংকের সাথে দেখে, বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না। কিন্তু এ গ্রামে সেটা অন্যরকম, জ্বিন ভূতের সাথে এখানে সবার একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। বিচিত্র কিছু ঘটে গেলে কেউ অবাক হয় না। মাথা নেড়ে বলে, আহ! জ্বিনটা দেখি আবার জ্বালাতন শুরু করল।

আমরা যে গ্রামে আছি, তার কাছেই শর্ষিনার পীরের আস্তানা। খবর পেলাম একদিন সেই পীর ঘোষণা করেছে হিন্দুদের সহায় সম্বল হচ্ছে 'গণিমত'-এর মাল এবং মুসলমানদের জন্যে তা লুটপাট করে নেয়া 'জায়েজ' আছে। এমনিতেই হিন্দুদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। এর পর সে এলাকায় তাদের অবস্থা হয়ে উঠল ভয়াবহ। আগে সাধারণ মানুষ লুটপাট করার কথা চিন্তা করতে পারতো না, এখন হঠাৎ করে লুটপাট করা ধর্মের অংশ হয়ে গেল। পৃথিবীতে ধর্মের নামে যত অবিচার হয়েছে, মনে হয় না তার সাথে আর কিছুর তুলনা করা যায়।

আস্তে আস্তে আমরা পুরো ব্যাপারটাতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। মিলিটারি এলে আমরা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকি, বুড়ো মানুষেরা লম্বা বাঁশের ডগায় পাকিস্তানের কুৎসিত পতাকাটি ঝুলিয়ে বাড়ির সামনে দুলাতে দুলাতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

মিলিটারি কিছু বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে কিছু মানুষ মেরে চলে যায়। সবাই তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

এভাবে ছয় সাত মাস কেটে গেছে। এই সময়ে আস্তে আস্তে ভাইবোনদের একেক

আমার বাবা ছিলেন অসম্ভব সুন্দর চেহারার মানুষ। গায়ের রঙ ছিল ধবধবে ফর্সা। আমরা গায়ের রংকে একটু বেশি গুরুত্ব দিই, ফর্সা হলেই চেহারায় ছিরি ছাদ থাকুক আর নাই থাকুক আমরা মানুষ বলি সুন্দর। বাবা শুধু ফর্সা ছিলেন না তার চেহারায় ছিরি ছাদ ছিল। খাড়া নাক, উজ্জ্বল চোখ, কুচকুচে মাথাভরা চুল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু তার শরীর ছিল কিশোরের মতো হালকা পাতলা ছিপছিপে। এই অসম্ভব সুদর্শন মানুষটিকে এরকম অবস্থায় আমার মাকে আমি দেখতে দিলাম না, আমার মায়ের স্মৃতিতে বাবা না হয় বেঁচে থাকলেনই এক অচিন্তনীয় রূপবান রাজপুত্র হয়ে। তার শরীরে হাড়গুলো একটা একটা করে কফিনে সাজিয়ে তুলে আমার মাকে গিয়ে দ্বিতীয়বার তার মৃত্যুসংবাদ দিলাম। একটা গাছের নিচে হাঁটুতে মুখ গুজে বসে ছিলেন আমার মা। তিনি তখন প্রথমবার তার মৃত স্বামীর জন্যে কাঁদলেন। নির্জন একটা নদীর তীরে আমার দুঃখী মাকে কাঁদতে দেখে আমার বুকের ভেতরে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেল। আমি ঋষি দুর্বাসা নই, হলে সেদিন ছারখার হয়ে যেত অর্ধেক পৃথিবী।

পরদিন শহরের লোকজন মিলে ঈদগাহে আমার বাবার জানাজার ব্যবস্থা করল। হাজার হাজার মানুষ এল ভিড় করে, ঈদগাহে লোক আর ধরে না। কত লক্ষ মানুষ মারা গেছে এই দেশের জন্যে, তাদের শরীর মাঠে ঘাটে নদীতে পশু পাখি খুটে খুটে খেয়েছে, জীবনের শেষ সম্মানটুকুও কারো কপালে জোটেনি। আমার মনে হল বাবার জানাজাটা যেন অনেকটা তার একটা প্রতিবাদ। যারা তাদের ভালোবাসার মানুষকে আদর করে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারেনি তাদেরকে যেন বলা হল, শোনো তোমরা, আমরা তোমাদেরকে এভাবে বুকে ধরে শুইয়ে দিতাম মাটির বুকে। পিশাচের দল আমাদের সে সুযোগ দেয়নি। এই দেখো একজনকে আমরা পেয়েছি, এই দেখো কত ভালবাসায় তাকে আবার শুইয়ে দিচ্ছি মাটির বুকে।

শহর থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় একজন বলল, আপনাদের একটা হরিণ ছিল না?

আমি বললাম, হ্যাঁ ছিল। কেন কী হয়েছে তার?

সে বলল, এখানে একজন লোক হরিণ খুঁজে পেয়েছিল, হতে পারে সেটা আপনাদের হরিণটা। দেখতে চান গিয়ে?

যুদ্ধোত্তর দেশে তখন আক্ষরিক অর্থে আমাদের কোনো থাকার জায়গা নেই, হরিণ রাখব কোথায়? ঢাকায় একটা বাসা ভাড়া করা হয়েছে, আসবাবপত্র বলে কিছু নেই। ইগলু আইসক্রিমের কাপে চা খাই, হলে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা আমাকে একটা কম্বল দিয়েছে, প্রথমে বলেছিল মেম্বার হতে হবে, আমি রাজি হইনি তখন এমনিতেই দিয়েছে। কেরোসিন কাঠের কয়টা চৌকি কেনা হয়েছে, সেখানে সবাই ঘুমোতে পারে না বলে

রাতে অন্যদের জন্যে মেঝেতে ঢালাও বিছানা করা হয়। তবু হরিণের কথা শুনে কেমন যেন আমার সব স্মৃতি ভিড় করে এল, বড় দেখতে ইচ্ছে করল হরিণটাকে, প্রাণীটা আমাদের সুখের সময়ের একটা চিহ্নের মতন। আমি খোঁজ করে সেই বাসায় হাজির হলাম, পরিচয় দিলাম কেন এসেছি বলতেই ভদ্রলোক আমাকে বাসার ভেতরে সমাদর করে নিয়ে গেলেন। চা-নাস্তা খাইয়ে বললেন, হরিণ একটি পেয়েছি সত্যি কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা আপনাদের হরিণ! আপনাদের হরিণটা শুনেছি বাসা লুট করার সময় মিলিটারিরা ধরে নিয়ে কেটে কুটে খেয়েছে।

আমি বললাম আমিও তাই শুনেছি। কিন্তু তবু আমি একবার আপনাদের হরিণটাকে দেখতে চাই। আমাদের খুব আদরের হরিণ ছিল, যদি এটা কোনোভাবে সেই হরিণটা হয়ে থাকে তাকে একটু আদর করে দিব। আমি তাকে নিব না, শুধু একবার দেখব। এখন নিয়ে রাখব কোথায় বলেন?

ভদ্রলোক আমাকে বাসার পিছনে নিতে নিতে বললেন, হরিণ কখনো পোষ মানে না, এটা যদি আপনাদের হরিণ হয়েও থাকে আপনাদের কাছে তো আসবে না। দূর থেকে দেখতে হবে। হরিণটা ছাড়া থাকে, বাসার পিছনে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, কারো কাছে আসে টাসে না।

বাসার পিছনে যেতেই দূরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটি হরিণ চকিত দৃষ্টিতে আমাদের লক্ষ করে আরো দূরে সরে গেল। ভদ্রলোক বললেন, কী মনে হয়? এটা কি আপনাদের হরিণ? এতোদূর থেকে তো বুঝতেও পারবেন না। একবছরে তো বড়ও হয়েছে অনেক।

আমার মনে হল জানি না, হঠাৎ আগের মতো সুর করে হরিণটাকে নাম ধরে ডাকলাম, ই-ই-ইরা....

হরিণটি চমকে মাথা ঘুরে তাকাল, তারপর দু-পা এগিয়ে এসে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

আমি আবার ডাকলাম, ই-ই-ই-ই-রা—

হরিণটা কয়েক মুহূর্ত চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলো। কিছু একটা মনে পড়ছে তার। প্রথমে দ্বিধান্বিতভাবে এক পা দুই পা করে এগিয়ে এল, একটু দাঁড়িয়ে আমাকে দেখল তারপর হঠাৎ ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসতে শুরু করল আমার দিকে। হরিণের ছুটে আসা দেখতে বড় সুন্দর, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ছন্দে বাধা কি চমৎকার তাদের পদক্ষেপ, মাটিতে যেন পা পড়ে না, বাতাসের উপর যেন ভেসে ভেসে ছুটে চলে। আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো হরিণটা, আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে, সাবধানে একবার শুকে দেখল আমার হাত। তারপর এল, হঠাৎ গলা তুলে একেবারে আমার বুকের কাছাকাছি কাছে এসে দাঁড়ালো। অনেক বড় হয়ে গেছে, মাথায় গজিয়েছে

কচি কচি দুটি শিং, তবু আমি চিনতে পারলাম তাকে, আমাদের ইরা। আমি ইরার গলা জড়িয়ে ধরে তারে আদর করে দিতে থাকি, অবোধ পশুটি তার কাজল টানা চোখে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন অভিমান করে এক্ষুণি বলবে, এতোদিন পরে তুমি এলে? এতোদিন পরে?

কেন জানি না আমার চোখ হঠাৎ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

(এই গল্পটি আত্মজৈবনিক। গল্প সংকলনে কেন একটি সত্যি ঘটনা জুড়ে দিয়েছি আমি নিজেও ভালো করে জানি না।—মুহম্মদ জাফর ইকবাল)

আজব ছেলে

শালার ব্যাটা আরেকটু হলে গাড়ি নিয়ে পানিতে গিয়ে পড়ত।

যাকে শালার ব্যাটা বলছি সে গাড়ির মালিক, আমার বড় সাহেব, আমি হচ্ছি তার ড্রাইভার। শুধু নামেই ড্রাইভার, আমার কাজ হচ্ছে গাড়ির পিছনে বসে থাকা, গাড়ি সেই চালায়। নতুন গাড়ি চালানো শিখেছে তাই উৎসাহের শেষ নাই। গাড়ি যে খারাপ চালায় তা না, কিন্তু হঠাৎ করে কিছু একটা করতে হলে সবসময় ঘাবড়ে গিয়ে উল্টা একটা জিনিস করে ফেলে। এই এখন যেরকম ফেরিতে ওঠার পর ফেরির লোকটা যখন চিৎকার করে বলল, রোককে—সাহেব ঘাবড়ে গিয় ব্রেকে চাপ না দিয়ে চাপ দিল এক্সেলেটরে। আরেকটু হলে এতোক্ষণে নতুন বৌ আর নতুন গাড়ি নিয়ে শালার ব্যাটা থাকতো একশো ফুট পানির নিচে, আর সাথে থাকতাম ফাটা কপাল আমি!

গাড়ির পিছনে বসে আমার মেজাজ গরম হতে থাকে। ধুত্তুরি শালার চাকরি, মুখে লাথি মেরে নেমে যাব একদিন, তখন দেখি কি হয়। ড্রাইভারের চাকরি দিয়ে গাড়ির পিছনে বসিয়ে রাখবে এটা কি একটা ফাজলেমি নাকি? এতো যদি সাহস তাহলে ব্যাটা তুই একলা গাড়ি নিয়ে বের হোস না কেন? সাথে সবসময় আমাকে কেন ঝুলিয়ে রাখতে হয়? নতুন বউকে নিয়ে ঢং করতে বের হয়েছিস তখনো পিছনে আমার মত জলজ্যান্ত একটা দামড়া জোয়ান। শালার কোনো লজ্জা শরমও নাই, আমার সামনেই বউয়ের সাথে মিঠা মিঠা প্রেমের কথা কয়। একটু সুযোগ পেলেই আবার গায়ে হাত—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় মরে যাই। আমাকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করে না, যেন একটা কোল বালিশ নিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা করে পিছন থেকে মাথার মাঝে লাগাই একটা ঘুষি।

গাড়ির চাকার নিচে ইট দিয়ে গাড়িটাকে আটকে দেয়ার সাথে সাথে সাহেবের সিগারেট খাওয়ার সখ হল। সাথে সিগারেট নাই তাই সামনে বসে হুকুম দিল, বদি, একটা ফিফটি ফাইভের প্যাকেট নিয়ে আস তো।

ইচ্ছা হল বলি, আমি ড্রাইভার, তোমার বাড়ির চাকর না। কিন্তু বলা গেল না, গাড়ি থেকে নেমে জানালার কাছে দাঁড়ালাম, সাহেব একশো টাকার একটা নোট বের করে আমার হাতে আলগোছে ফেলে দিল, ভাবখানা টাকা-পয়সা নোংরা জিনিস, বেশিক্ষণ হাতে ধরে রাখলে হাতে ঘা হয়ে যাবে।

লাট সাহেবের বউ বিড়ালের বাচ্চার মতো ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলল উঁ উঁ উঃ, তুমি আবার সিগারেট খাবে? উঁ উঁ উঁ—ইচ্ছা হল লাগাই মাথার মাঝে একটা গাট্টা, এতো বড় ছেমরি অথচ ঢং দেখ!

আমি সিগারেট নিতে এগিয়ে গেলাম। ফেরিটা দেখে বেশি বড় মনে হয় না কিন্তু একটার পর একটা বাস আর গাড়ি দেখি তুলেই যাচ্ছে। এতো অল্প জায়গার মাঝে এতো গাড়ি যে এঁটে যাবে আগে থেকে কিছুতেই বোঝা যায় না, কিন্তু সবসময় দেখি সত্যিই সব এঁটে যায়। শেষ গাড়িটা তুলে একজন খালাসি রেলিংটা তুলে দেয়। প্রায় সাথে সাথেই গর্জন করে ইঞ্জিনটা স্টার্ট করে ফেরি ছেড়ে দিল, বাংগালি জাতির মনে হচ্ছে উন্নতি হয়েছে, সময়ের জ্ঞান হয়েছে একটু। ঠিক তখন দেখা গেল একজন মানুষ ছুটতে ছুটতে আসছে। সব সময় এরকম হয়, কিছু মানুষ থাকে তারা সময় মতো কিছু করতে পারে না, বাস ট্রেন ফেরি ঠিক যখন ছেড়ে দেয় তখন পেস্থাব করতে বসে। তারপর পেস্থাব শেষ না করেই জান নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে, কিছু আগে খেয়াল থাকে না। জেটি থেকে ফেরিটা তিন হাতের বেশি সরে গেছে এর মাঝেই এই শালা দিল একটা লাফ! লুঙ্গি বাতাসে উড়ে গিয়ে এক ঝলকের জন্যে তার লোমশ পাছা বের হয়ে গেল। ফেরির মানুষ আনন্দে চিৎকার করে উঠল সাথে সাথে। তার লোমশ পাছা দেখার আনন্দে, না পানিতে না পড়ে লোকটা ঠিকভাবে ফেরিতে উঠতে পেরেছে সে জন্যে ঠিক বোঝা গেল না। আজকালকার পাবলিক বোঝা বড় মুশকিল।

সিগারেট কেনার সময় দেখলাম আরেকজন পাবলিক বেঞ্চে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুকনা চিড়া চিবিয়ে খাচ্ছে। খিদের সময় বহুদিন শুকনা চিড়া চিবিয়ে খেয়েছি আমি, এই জিনিস আমি খুব ভালো চিনি। অল্প খেয়ে পেট ভর্তি করার জন্যে এর উপরে আর কোনো জিনিস নাই। মানুষ গরিব হয়ে যাওয়ার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে শুকনা চিড়া চিবিয়ে খাওয়া। এই পাবলিককে দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে একসময় ভালো অবস্থায় ছিল, এখন হঠাৎ গরিব হয়ে গেছে। এর চেহারা এবং পোশাকে এখনো সেটা ধরা যায়। ময়লা একটা শার্ট পরেছে, সাথে ফুলপ্যান্ট। ফুলপ্যান্ট আবার গুটিয়ে উপরে তোলা। কিন্তু খালি পা। বয়স বেশি না, খুব ধরে বেঁধে কুড়ি হবে, আমার থেকে এক দুই বছর ছোটই হবে মনে হয়। দেখতে কলেজের ছাত্রের মতো লাগে, তবে পোশাকটা ছাত্রের নয়। পোশাকটা বড় জিনিস, ভালো জামা কাপড় পরলে আমাকেও দেখতে ইউনিভার্সিটির ছাত্রের মতো দেখায়। হলুদ শার্ট আর জিনসের প্যান্ট পরে

একদিন নিউ মার্কেটে একটা বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি একটা মেয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি কী কবিতা পড়েন?

আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম, সেই স্কুলে পড়াশোনা করার সময় কবিতা পড়েছিলাম, মুখস্থ হতো না বলে কী মারটাই না খেতাম। ফেল করে করে যখন পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে দিয়েছি আর কবিতা মুখস্থ করতে হবে না সেটাই ছিল একটা বড় আনন্দ। কিন্তু এই মেয়েকে তো আর সেটা বলা যায় না। গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললাম, পড়ি।

মেয়েটা বলল, আমাকে একটা ভালো কবিতার বই বেছে দেবেন, প্লীজ? আমার এক বান্ধবীর জন্যে, খুব তার শরীর খারাপ, পড়ে মন ভালো হয়ে যায় এরকম একটা বই বেছে দেবেন?

আমার বুক ধুক্‌ধুক্‌ করছিল, তার মাঝেই টেলিভিশনে বাংলা নাটকের হিরোরা যে রকম ভাব করে কথা বলে সেরকম একটা ভাব করে বললাম, নিশ্চয়ই দেব। চলুন।

মেয়েটা আমার সাথে দোকানে ঢুকলো, আমি গম্ভীর হয়ে কবিতার বই দেখতে লাগলাম, এমন একটা ভান করলাম যেন আমি কবিতার সব নাড়ী নক্ষত্র জানি! কে একজন বলেছিল হিন্দুরা নাকি ভালো কবিতা লেখে, মুসলমানরা গরুর গোশত আর পেঁয়াজ খায় বলে তাদের কবিতার ভাব নষ্ট হয়ে যায়। সত্যি মিথ্যা জানি না, তবু বেছে একজন হিন্দু মানুষেরই বই বের করে দিলাম, দেখতে সুন্দর ছাপা ভালো ভেতরে বেশি কঠিন শব্দ নেই, দামও সেরকম বেশি না। মেয়েটা খুব খুশি হয়ে সেই বইটা কিনে নিয়ে গেল।

এ মেয়েটার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। আমি সময় পেলেই আমার হলুদ শার্ট আর জিন্‌সের প্যান্টটা পরে ঐ বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। যদি আবার কোনোদিন দেখা হয় জিজ্ঞেস করতে হবে তার বান্ধবীর কী খবর। আমার যা কপাল মনে হয় বলবে আমার বেছে দেয়া বই পড়ে তার বান্ধবী একেবারে টেঁসে গিয়েছে।

সিগারেট কিনে ফিরে এলাম। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে আমার সাহেব শালার ব্যাটা বলল, বদি এক প্যাকেট সিগারেট আনতে এতোক্ষণ লাগল? কিনে আনলে নাকি ফ্যাক্টরি থেকে বানিয়ে আনলে?

ইচ্ছা হল গালে একটা চড় দিয়ে বলি, গোলামের পুত এতো যদি তাড়াহুড়া নিজে গিয়ে কিনিস না কেন? আর আমাকে বদি বলে ডাক এতো বড় সাহস? একসময় বাপ না দুইটা খাসি জবাই করে নাম রেখেছিল বদিউল। পুরোটা যদি ডাকার শক্তি না থাকে ডেকো না, কেউ তোমাকে বদি বলে ডাকার জন্যে সাধাসাধি করছে না। আমি কী তোমার কাউসার নামটাকে ভেঙে 'কাউ' না হলে 'কাউয়া' বলে ডাকি?

কিন্তু বলা গেল না, সাহেব খুব একটা মজার কথা বলেছে এরকম একটা ভাব করে

সরে এলাম। আসার সময় শুনলাম বউ বলছে, তুমি সবসময় এরকম করে খোঁচা দিয়ে কথা বলো কেন? একটু দেরি হয়েছে তো কী হয়েছে?

এ ছেমরিটা আসলে খারাপ না, মনটা ভালো আছে, মনে হয় ভালো ফ্যামিলি থেকে এসেছে। তবে বিয়ে হয়েছে একটা জানোয়ারের সাথে। আর কয়দিন তারপর এই ছেমরিও ডাইনি হয়ে যাবে, টাকা পয়সা জিনিসটা মনে হয় বিষের মতো যাকে ধরে একেবারে পিশাচ বানিয়ে ফেলে।

ফেরিতে ভীষণ ভিড়। তার মাঝে হাঁটতে হাঁটতে আমি সিগারেট ধরালাম। লোমশ পাছা দেখিয়ে যে লোকটা লং জাম্প দিয়ে ফেরিতে উঠেছে সে রেলিংয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। লোকটার চেহারার মাঝে একটা হাসি খুশির ভাব আছে, ফেরিসুদ্ধ মানুষ যে তার পাছা দেখে ফেলেছে সেটার জন্যে তাকে সেরকম বিচলিত মনে হল না। চিড়া খাওয়া পাবলিক এখনো চিড়া খেয়ে যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে গলা দিয়ে নামছে না তার, তবু চিবিয়ে যাচ্ছে। চিড়া জিনিসটা খেতে তো খারাপ না। মনে হয় এর একেবারেই অভ্যাস নাই। কে জানে হয়তো একেবারে হঠাৎ করে গরিব হয়ে গেছে। আমি ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেলাম, দেখি কায়দা করে বের করা যায় কী না বিষয়টা কী।

আলাপ শুরু করার জন্যে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে মুখে একটা সিগারেট চেপে ধরে জিজ্ঞেস করা আগুন আছে কিনা। সেটাই চেষ্টা করলাম জিজ্ঞেস করলাম, আগুন আছে ভাই?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, আমি সিগারেট খাই না।

আমি বেঞ্চ ঠেলে তার পাশে বসে পড়ে বললাম, সিগারেট না খাওয়াই ভালো। স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। উত্তরে সে একটা কিছু বলবে ভেবেছিলাম, কিন্তু বলল না। আমি এবারে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, ঢাকা থেকে আসছেন?

সে মাথা নাড়লো।

কোথায় যাবেন?

ছেলেটা উত্তর দিতে চাইলো না, বলল, ঐ তো ওদিকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নদীর পানির দিকে তাকিয়ে রইলো।

মানুষ হঠাৎ করে গরিব হয়ে গেলে নানা রকম দুর্বলতা এসে যায়। কথাবার্তা বলতে চায় না, আমি তবু ছেড়ে দিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, কিসে যাচ্ছেন? বাসে?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, না।

তাহলে?

উত্তর না দিয়ে সে তার পায়ের কাছে রাখা একটা ব্যাগ থেকে একটা বোতল বের করে সেখান থেকে ঢক্ ঢক্ করে পানি খেলো। আমি জানি এটা পানি তবু আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, কী খান?

জল। পানিকে জল বলল, তার মানে এই পাবলিক হিন্দু। চেহারা দেখে বোঝা যায় না।

পানি সাথে এনেছেন? এইখানে তো পানি আছে।

ছেলেটা কথার উত্তর দিল না। আবার নদীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

মহা অভদ্র মানুষ দেখি। হিন্দুরা তো সাধারণত কথাবার্তায় ভদ্র হয়, কিন্তু এই কেসটা মনে হচ্ছে খারাপ। মনে হয় ইন্ডিয়ায় ভেগে যাচ্ছে। কেন ভেগে যাচ্ছে কে জানে। খুন খারাপী করেছে নাকি? আজকাল কোনো রকম গ্যারান্টি নাই, ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা খুন খারাপি করে ফেলে। ব্যাপারটা আরেকটু দেখতে পারলে হতো, কিন্তু সময় নাই। ফেরি ঘাট দেখা যাচ্ছে, নামতে হবে একটু পরে। আমাকে না দেখলে আমার সাহেব আবার চেচামেচি করে একটি মহা ঝামেলা বাঁধাবে।

ফেরি থেকে নামার সময় সাহেব আবার একটা অনর্থ বাধালো। ক্লাচে চাপ না দিয়ে গিয়ার পাল্টে ফেলল, গাড়ির ভেতর থেকে এরকম ভয়ানক শব্দ বের হল যে আমি ভাবলাম এই গাড়িটা বুঝি শেষ। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে একটা বিশ্রী অবস্থা, কোনোমতে আবার স্টার্ট করে শেষ পর্যন্ত গাড়িটাকে উপরে তুলে আনল, গিয়ারের দাঁত নিশ্চয়ই গেছে একটা দুইটা! আমার কি, আমি তো আর মালিক না, আমি হচ্ছি ড্রাইভার। ড্রাইভার রেখেও তুমি যদি তোমার গাড়ি ভেঙে টুকরা টুকরা করতে চাও আমি কী করতে পারি? কিন্তু আর বেশি দিন না, এই রকম চাকরি আমার পোষাবে না। হাতে একটু টাকা হলেই ঘুষ দিয়ে পাসপোর্টটা করে চলে যাব আবুধাবি। এই যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

ফেরি ঘাটে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সাহেব আর বিবি গাড়ি থেকে নামলো। আমিও নামলাম, অনেকক্ষণ থেকে তলপেটে চাপ চাপ লাগছিল, সুযোগ পেয়ে রাস্তার পাশে নেমে পেশাব করে হালকা হয়ে এলাম। আমাকে দেখেই আবার হুকুম হল সাহেবের, দেখ তো মাছ উঠেছে কি না ফেরি ঘাটে।

বড় লোক হলে এই হচ্ছে মুশকিল। সবাইকে সবসময় মনে করিয়ে দিতে হয় যে সে বড় লোক। এই শালার ব্যাটা মাছ খেতে গেলে খায়ই না, মাছ খেলে নাকি তার মুখ গন্ধ করে। তবুও ফেরীঘাট থেকে সবচেয়ে বড় মাছটা তাকে কিন্তু কিনতেই হবে। ফুটানী আর কি, সবাই দেখবে শালার ব্যাটা বুক উঁচু করে হাঁটবে। চুরি করা টাকা দিয়ে এতো ফুটানী, কষ্ট করে রোজগার করলে কী করতো কে জানে!

সাহেব তার আহ্লাদী বউকে নিয়ে এগিয়ে এল। শহরের মেয়ে, কাদামাটির উপরে হেঁটে অভ্যাস নেই, আছাড় খেয়ে পড়ে পড়ে অবস্থা। শাড়িটা শরীরে প্যাচিয়েছে খুব ভালো করে, ঢলঢলে যৌবন যেন বোঝা না যায়। বড় লোক বন্ধু-বান্ধবদের সামনে এদের শাড়ির আঁচল একবার এদিকে পড়ে একবার ওদিকে পড়ে, কিন্তু সাধারণ

মানুষদের সামনে এরা খুব সাবধান, শরীরের কিছু দেখা যায় না।

সাহেব কাছে এসে কাতল মাছটা দেখে গলা উঁচিয়ে বলল, কার মাছ?

ছেলেটা সাহেবের দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল, আমার।

কোথায় ধরেছিস?

বিলে।

বিলের মাছ খাওয়া যায় নাকি? মাটি মাটি গন্ধ করে।

বলে দিল একটা কথা! শালার ব্যাটা কোথায় তুমি এ জিনিস শিখেছ, যে বিলের মাছে মাটি মাটি গন্ধ করে? যা মুখে আসে তাই বলে ফেলবে? আর মাটি মাটি গন্ধ আবার কি জিনিস? কোনোদিন তুমি মাটি খেয়ে দেখেছ? রাগে আমার গা জ্বলে গেল।

তোল দেখি মাছটা, দেখি কতো বড়।

ছেলেটা না তাকিয়ে বলল, এটা বিক্রির না।

সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বিক্রির না মানে?

ছেলেটা চোখ সরু করে বলল, মানে এই মাছ বিক্রি হবে না।

দেখলাম সাহেবের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। জোরে ধমক দিয়ে বলল, তোল মাছটা উপরে দেখি কত বড়।

ছেলেটা সাহেবের দিকে না তাকিয়েই নদীতে পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, বলেছি তো এই মাছ বিক্রির না।

সাহেব রাগে একেবারে ফেটে পড়ল এবারে, তোল বলছি ব্যাটা বদমাইস।

ছেলেটা সোজা সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার সাথে মেজাজ কইরেন না, আমি আপনাদের বাপের গোলাম না। আমার মাছ ইচ্ছা হলে বেচুম, ইচ্ছা না হলে বেচুম না।

এক আঙুল ছেলের সাহস আছে, সোজা সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো, চোখের পাতি পর্যন্ত ফেলল না।

এই রকম সময়ে দশজন লোক সাধারণত বড়লোকদের পক্ষ নিয়ে গরিব মানুষকে ধমকাধমকি করে, তখন বড়লোকের রাগ কমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত গরিব লোকের সাথে একটা আপোষ হয়ে যায়। এবারেও সেটা শুরু হল। আপোষ করার জন্যে যে লোকটি এগিয়ে এল সে টিংটিংয়ে রোগা, লুঙ্গিটাকে বিপজ্জনকভাবে উপরে তুলে ধরে রেখেছে এবং খুব মনোযোগ দিয়ে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকাচ্ছে। কাছে এসে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, কি হইছে রে কাউলা।

কিছু না কাচু ভাই। একটু থেমে যোগ করল, মাছে নাকি মাডি মাডি গন্ধ। আমি মাছ বেচুম না।

কাচু ভাই নামের লোকটা এবারে দাঁত বের করে হেসে ফেলল, দেখা গেল তার

দাঁতও পান খেয়ে টুকটুকে লাল। সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাগো কাউলার জিদ বড় বেশি স্যার। হে যদি কয় আপনের কাছে মাছ বেচব না, তয় মাছ নদীতে ছাইড়া দিব তবু মাছ বেচব না।

সাহেব ভয়ংকর মুখ করে লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার বউ হাত খামচে ধরে বলল, এটা কাতল মাছ। তুমি তো কাতল মাছ খাও না।

কাতল নাকি?

হ্যাঁ।

উপস্থিত লোকজনও ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলতে খুব ব্যস্ত। সবাই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, জে স্যার এইটা কাতল মাছ।

ও। আমি ভেবেছিলাম রুই।

টিংটিংয়ে লোকটি জোরে জোরে কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, না স্যার রুই মাছের মাথা আরো ছোড হয়। ঐ দিকে রুই মাছ আছে?

লোকটির কান চুলকানো দেখে আমার একটু ভয়ই লাগলো, ম্যাচের কাঠির ঘষা লেগে লেগে তার কানের ভেতর হঠাৎ না ফস করে আগুন ধরে গিয়ে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হয়ে আসে।

আমার সাহেব আর কোনো কথা না বলে সরে এল। রুই মাছ কেনার বেশি উৎসাহ দেখালো না, একটু হেঁটে গাড়িতে ফিরে এল। গাড়ি স্টার্ট দেয়ার পরও কোনো কথা নেই। ছোট ছেলেটা মনে হয় তার দিনটাই মাটি করে দিয়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে শালার ব্যাটার, মানুষকে মানুষ জানে না, যাকে যেটা ইচ্ছে সেটা বলে দেয়। ছোট ছেলেটা ভালো টাইট দিয়েছে, ছোট বলেই পেরেছে, বড় হলে পারতো না। গরিব মানুষ বড় হলে ভীতু হয়ে যায়। তবে আমার জন্যে ব্যাপারটা খারাপ হল। গরম মেজাজটা এখন ঢালবে আমার উপর। কপাল ভালো বউটা আছে সাথে। না হলে আমার কপালে আজকে অনেক দুঃখ ছিল।

বউটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল হঠাৎ বলল, ঐ দেখ ঐ অবাক ছেলেটা দেখ।

সাহেব বাইরে তাকাল, আমিও তাকালাম। দেখলাম, ফেরিতে বসে যে ছেলেটা চিড়া খাচ্ছিল সে রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। গাড়ি তার পাশ দিয়ে হুঁশ করে বের হয়ে গেল, আমি যতক্ষণ পারলাম তাকিয়ে লক্ষ করলাম ছেলেটাকে। কিছু একটা জিনিস গোলমাল আছে ছেলেটার, সাহেবের বউটাও সেটা খেয়াল করেছে। খুব জোরে হাঁটছে ছেলেটা, মানুষের যখন বেশি হাঁটতে হয় এতো জোরে হাঁটে না, এতো জোরে হাঁটলে মানুষ কাহিল হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, বেশি হাঁটতে পারে না। ছেলেটার মনে হয় হেঁটে অভ্যাস নাই।

বউটা বলল, ছেলেটার মাঝে কী একটা জিনিস যেন ঠিক নাই।

আমি পিছন থেকে বললাম, মনে হয় মার্ডার করে এসেছে।

বউটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, সে কী, এইটুকু একটা ছেলে মার্ডার করে আসবে কেন?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আজকাল দিন পাল্টে গেছে আপা, এর থেকে ছোট ছোট ছেলেরা মদ গাঁজা খায়, হাইজ্যাকিং, মার্ডার করে ফেলে।

কিন্তু এ মার্ডার করেছে আপনি কেমন করে জানলেন, ড্রাইভার সাহেব?

এই মেয়েটার মনটা ভালো আছে। আমার সাথে আপনি করে কথা বলে, বদি না ডেকে ড্রাইভার সাহেব ডাকে। আমি গম্ভীর ভাব করে বললাম, এর সাথে আমি কথা বলেছি আপা।

আপনাকে বলেছে যে মার্ডার করেছে?

না, তা বলে নাই, কিন্তু কাজকর্ম খুব সন্দেহজনক। মনে হয় ইন্ডিয়া ভেগে যাচ্ছে।

বউটা আরো অবাক হয়ে গেল, ইন্ডিয়া ভেগে যাচ্ছে?

জে। ছেলেটা হিন্দু।

হিন্দু হলেই ইন্ডিয়া পালিয়ে যেতে হবে?

জে, কিছুতেই বলতে রাজি হল না কোথায় যাচ্ছে।

তাতেই আপনি ধরে নিলেন সে মার্ডার করে ইন্ডিয়া ভেগে যাচ্ছে? আপনি তো মহা সাসপিশাস মানুষ?

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম, সাসপিশাস মানে কী কে জানে, খারাপ গালি-টালি নাকি আবার? দুর্বল গলায় বললাম, বসে বসে শুকনা চিড়া চিবিয়ে খাচ্ছিল।

শুকনা চিড়া?

সাথে বোতলে করে পানি। মানুষ যখন পালায় তখন শুকনা চিড়া নিয়ে পালায়।

কেন?

চিড়া নষ্ট হয় না আপা। অনেকদিন রাখা যায়, খাওয়ার জন্য রান্নাও করতে হয় না, তাছাড়া একটু খেলেই পেট ভরে যায়। মানুষ পালানোর সময় সবসময় সাথে চিড়া নেয়। এও পালাচ্ছে। ইন্ডিয়া পালাচ্ছে।

আমার সাহেব এতোক্ষণ কোনো কথা না বলে আমাদের কথা শুনে যাচ্ছিল। এবারে সে যোগ দিল, বলল, আমার মনে হয় বদি হ্যাজ এ পয়েন্ট। এই ছোকড়ার হাবভাব খুব সন্দেহজনক।

কী বাজে কথা বলো? তোমাদের মনটাই প্যাঁচানো। বেচারার হয়তো কোনো বিপদ হয়েছে, হয়তো কোনো দুঃসময় যাচ্ছে, হয়তো—

আরে না। দুঃসময় টময় না, এই শালা মালাউন। কিছু একটা ঘাপলা করে ভেগে যাচ্ছে। বদিই ঠিক বলেছে। আমাদের উচিত ছিল ভালো করে কথা বলে দেখা। যদি সত্যিই দেখা যায় সন্দেহজনক তাহলে পুলিশকে বলে দেয়া উচিত ছিল।

সাহেবের কথা শুনে বউটা একটু রেগে উঠল, বলল, কত বড় ক্রাইম চোখের সামনে হয়ে যায় কেউ একটা কথা বলে না, আর এখন একটা ইনোসেন্ট ছেলে পেটের খিদেয় শুকনা চিড়া চিবিয়ে খাচ্ছে বলে তাকে পুলিশে দিয়ে দিতে চাইছ? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?

সাহেব একটু লজ্জা পেলো মনে হয়, কে জানে কোনো ক্রাইমের কথা বলছে। আমার সাহেবের এই টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সবই তো চুরি, সবই তো ক্রাইম। সেগুলোর কথাই বলছে নাকি কে জানে। সাহেব বলল, আচ্ছা ঠিক আছে যাও একে পুলিশে দেব না। কিন্তু তারপর ঢাকা ফিরে গিয়ে যদি শোনো জোড়া খুন করে এ পালিয়ে গেছে তখন আমাকে দোষ দিও না।

সাহেব আর বউ তখন আস্তে আস্তে মিঠা মিঠা ঝগড়া শুরু করল। এগুলো আসলে ঝগড়া নয়, এ এক রকমের রং তামাশা। পড়াশোনা জানা শিক্ষিত লোক ছাড়া আর কেউ এগুলো করতে পারে না। ভালোই লাগে শুনতে, পরিষ্কার করে কিছু বলে না, হাবে ভাবে বলে। কিছু বোঝা যায় কিছু বোঝা যায় না। আমি শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে পিছনে ঘুমিয়ে গেলাম। আমার ঘুমটা ভালো না, ঘুমালেই কেন জানি মুখটা হাঁ হয়ে যায়। সাহেব আয়নায় সেটা দেখে আবার কিছু একটা না বলে ফেলে!

ঘুম ভাঙলো হঠাৎ করে, গাড়ি প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষেছে, আমি হুমড়ি খেয়ে পড়েছি সামনের সিটে। প্রথমে ভাবলাম একসিডেন্ট—একটা চিৎকার প্রায় দিয়েই ফেলেছিলাম, কিন্তু দেখলাম এক্সিডেন্ট না, সাহেব একটা চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ি থামিয়েছে। অভ্যাস নাই তাই আস্তে না থামিয়ে জান দিয়ে চেপে ধরেছে ব্রেক। সাহেব জানালা দিয়ে গলা বের করে বলল, হ্যাঁ, এইটাই সেই জায়গা।

কোন্ জায়গা বুঝতে পারলাম না। নিজে থেকে জিজ্ঞেস করা ঠিক না, তাই চুপ করে বসে রইলাম আরো কিছু বলে কি না শোনার জন্য। বউটি বলল, সত্যি যেতে যাও?

হ্যাঁ। চল দেখা করে আসি, খুব অবাক হবে।

তোমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড?

না সেরকম ক্লোজ না। ভালো ছাত্র ছিল সেজন্যে আমাদের বেশি পাত্তা টাত্তা দিত না। এখন নিশ্চয়ই দেবে। একটা গ্রামে এন.জি.ও. প্রজেক্ট নিয়ে পড়ে আছে। আমাদের পাত্তা না দিয়ে যাবে কোথায়?

তাহলে কেন যেতে চাইছ? এখানে সময় নষ্ট করলে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে না?

দেরি হলে ক্ষতি কি আছে? চল, দেখবে, তোমার ভালো লাগবে, খুব শার্প ছেলে

ছিল, কথা বললেই বুঝবে।

সাহেব গাড়ি থেকে নেমে বলল, যদি তুই একটু অপেক্ষা কর, আমরা আসছি। গাড়ি ছেড়ে যাবিও না কিন্তু এসব জায়গা ভালো না। আমি বললাম, ঠিক আছে স্যার।

দু'জন নেমে গেল। কথা শুনে মনে হল আমার সাহেব তার কোনো এক ছেলেবেলার বন্ধুর সাথে মাতব্বরি করে আসতে যাচ্ছে। বন্ধুটি একসময় পড়াশোনায় তার থেকে ভালো ছিল বলে বেশি পাত্তা পেতো না, এখন পয়সা কড়ি হয়েছে, তাই তার শোধ নিতে যাচ্ছে! ছোটলোক আর কাকে বলে।

আমি গাড়ি থেকে নেমে একটু হাঁটাহাটি করলাম, একটা সিগারেট খেলাম, খানিকক্ষণ রাস্তার পাশে বসে লোকজন গাড়ি বাস ট্রাক যেতে দেখলাম, তারপর বিরক্ত হয়ে গাড়িতে পিছনের সিটে বসে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম।

আমার ঘুম খুব খারাপ, যখন ঘুমাই শুধু যে মুখ হাঁ হয়ে যায়। তাই না, মুখের পাশ দিয়ে একটু লালা গড়িয়ে পড়তে থাকে। তাছাড়া যেটা সবচেয়ে বিপদজনক সেটা হচ্ছে আমি একসাথে কয়েক ঘন্টার জন্যে একেবারে অচেতন হয়ে যাই, পৃথিবীর আর কোনো কিছুর খেয়াল থাকে না। এবারও তাই হল। যখন ঘুম ভাঙলো তখন একেবারে বিকেল হয়ে গেছে। প্রথমে একটু সময় লাগলো বুঝতে কোথায় আছি। দুই সেকেন্ড পরে মনে পড়ল সবকিছু। আমি আমার সাহেবের গাড়ি পাহারা দিচ্ছি—সাহেব তার বৌকে নিয়ে গেছে তার এক বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্যে। কিন্তু সে তো কম করেও হলেও প্রায় তিন ঘন্টা আগে। আমি তিন ঘন্টা ধরে ঘুমিয়ে আছি? কি সর্বনাশ! আর সাহেব বিবির হল কি? এখনো তারা আসে না কেন? আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম।

তলপেটে প্রচণ্ড চাপ। গাড়ি খুলে বের হয়ে রাস্তার পাশে বসে পেশাব করে হালকা হয়ে উঠে এলাম, তখন দেখি সেই আজব ছেলে হেঁটে আসছে। দেখে আমি চমকে উঠলাম—এই আলামত গত চার ঘন্টা থেকে হাঁটছে? মাথা খারাপ নাকি? বাসে যায় না কেন?

ছেলেটি আমাকে চিনতে পারেনি, কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, বিরইপুর আর কতদূর জানেন?

এই রাস্তা আমি মোটামুটি চিনি। বললাম, আরো দশ বারো মাইলের মতো।

ও। আর কোনো কথা না বলে সে আবার হাঁটা দিল। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বিরইপুরে কোথায় যাচ্ছেন?

কোথাও না।

তাহলে?

ছেলেটা উত্তর না দিয়ে একটু কাঁধ ঝাকালো। শিক্ষিত মানুষজনের মাঝে আজকাল এই একটা নতুন কায়দা শুরু হয়েছে দেখছি। মুখে উত্তর না দিয়ে একবার একটা কাঁধ

ঝাকুনি দিয়ে দেয়, ঢং দেখে মরে যাই। এও দেখি তাই করছে। তার মানে এটা লেখাপড়া জানা ছেলে। জিজ্ঞেস করলাম, ফেরি ঘাট থেকে এতোদূর হেঁটে হেঁটে আসলেন?

ছেলেটা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, এবার মনে হয় চিনতে পারল আমাকে। বলল, হ্যাঁ।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন? বাস নিচ্ছেন না কেন?

এই এমনি। বলে সে আবার কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটছে একটু খুড়িয়ে খুড়িয়ে, পা দুইটার অবস্থা খারাপ। দেখে মনে হয় দুই পায়ের উপর দিয়ে যেন বুলডোজার চলে গেছে। নখ উঠে পা কেটে রক্তারক্তি অবস্থা। এরকম পা দিয়ে কেউ এতোদূর হাঁটে? নাকি হাঁটতে হাঁটতেই এই অবস্থা হয়েছে? কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই এই আলামত হাঁটতে হাঁটতে বহু দূরে চলে গেল। এবারে আমার আর কোনো সন্দেহ থাকলো না যে এর ভেতরে কোনো গোলমাল আছে। যখনই বুঝতে পেরেছে তাকে আমি ফেরিতে দেখেছি আলাপ না বাড়িয়ে সাথে সাথে সরে পড়েছে। সাহেব মনে হয় ঠিকই বলেছে পুলিশকে এর কথা বলে দেয়া দরকার।

কিন্তু সাহেব আর বিবির কোনো খোঁজ নেই। সত্যি কথা বলতে কি আমার বেশ দুশ্চিন্তাই শুরু হল। খোঁজ নেয়ার জন্যে গাড়ি ছেড়ে নড়তেও পারি না। দিনকাল ভালো না, শহরের মানুষ গ্রাম গঞ্জে গিয়ে কোনো ঝামেলায় পড়বে তার ঠিক আছে? বিশেষ করে আমার সাহেব আবার রগচটা মানুষ—মানুষ জনের মান সম্মান রেখে কথা বলতে পারে না।

সাহেব তার বউকে নিয়ে ফিরে এল আরো প্রায় আধঘন্টা পর। তার সেই বন্ধুর সাথে হেঁটে তাকে পৌঁছে দিতে এসেছে। বন্ধুটির লম্বা চুল, মুখে বড় বড় দাড়ি গোঁফ, জোয়ান বয়সে কবি রবীন্দ্রনাথ মনে হয় দেখতে এরকম ছিলেন। কথাবার্তা শুনে মনে হতে লাগলো হঠাৎ করে আমার সাহেব হাজির হওয়ার ব্যাপারটিতে এই কমবয়সী রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দ পেয়েছে। বউটিও খুব খুশি হয়ে এসেছে, কি রকম খাতির যত্ন হয়েছে বোঝা গেল না, কিন্তু কম বয়সী রবীন্দ্রনাথ নিজে রান্না করে কিছু একটা খাইয়েছে বলে মনে হয়, সেটা বউটি বারবার উল্লেখ করতে থাকলো, শালার আমি যে এখানে পেটে গিট্টু মেরে বসে ছিলাম কারো কী মনে আছে?

যাই হোক সাহেব আবার গাড়ি ছাড়ার পর আমি কথা বললাম, স্যার আপনাদের দেরি দেখে একটু চিন্তার মাঝে ছিলাম।

চিন্তার কি আছে, আমি কী বাচ্চা ছেলে?

জে, তা ঠিক। একটু থেমে বললাম, স্যার ঐ ছেলেটা একটু আগে এদিক দিয়ে গিয়েছে?

কোন্ ছেলে?
ঐ যে হিন্দু ছেলেটা। ফেরিতে যে বসে বসে চিড়া খাচ্ছিল। ফেরি থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছে।
তাই নাকি? সাহেব অবাক হয়ে বলল, হেঁটে এসেছে এতোদূর?
জ্বী স্যার। পায়ের অবস্থা খুব খারাপ।
বউটা জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে পায়ে?
নখ উঠে গেছে, পা কেটে-কুটে রক্ত-টক্ত বের হচ্ছে।
কেন?
হেঁটে অভ্যাস নাই মনে হয়।
আহা বেচারা!
আমাকে জিজ্ঞেস করল বিরইপুর কতদূর।
কতদূর সেটা?
আরো দশ মাইল। বিরইপুর থেকে বর্ডারের রাস্তা আছে।
সাহেব বলল, তাই নাকি।
জ্বী স্যার।
তুমি কেমনে জানো?
আমি জানি স্যার। এই রাস্তাঘাট আমি ভালো করে চিনি।
তাহলে তোমার সন্দেহই ঠিক। এই ছেলে ইন্ডিয়া যাচ্ছে?
আমার তাই মনে হয় স্যার।
পুলিশে খবর দেয়াই উচিত ছিল।
জে স্যার। আরেকটু সামনে গেলেই মনে হয় তাকে পেয়ে যাব। এখনো নিশ্চয়ই বেশিদূর যেতে পারে নাই।
সাহেবের মনে হয় খুব উৎসাহ হল, বলল, চোখ খোলা রাখ তো দেখা যায় নাকি ব্যাটাকে।
সত্যিই ছেলেটাকে একটু পরে দেখা গেল। একটা গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে বোতল থেকে পানি খাচ্ছে। সাহেব ব্রেক চাপ দিতেই বউ একটু ভয় পেয়ে বলল, থামছো কেন? তুমি কী করবে?
কিছু করব না। শুধু একটা দুইটা প্রশ্ন করব।
কেন ঝামেলা করছো?
ঝামেলা কে বলেছে? সিটিজেন হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে না?
সত্যি যদি ছেলেটা কিছু করে এসে থাকে তাহলে ওর কাছে আর্মস থাকতে পারে।
সাহেব এমন একটা মুখের ভাব করল যার অর্থ কার এতো বড় সাহস আছে যে

আমাকে কিছু করবে? বোকা মানুষেরা মনে হয় একটু সাহসী বেশি হয়।
গাড়ি থামিয়ে দরোজা খুলতেই বউ সাহেবের দিকে তাকিয়ে মুখ কাচুমাচু করে বলল, প্লীজ।
সাহেব না দেখার ভান করে নেমে গেল, মজা দেখার জন্য আমি পিছে পিছে গেলাম। সাহেব ছেলেটার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী?
ছেলেটা এমন ভাবে সাহেবের দিকে তাকাল যেন খুব একটা মজার প্রশ্ন করেছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিল না।
কোথায় যাচ্ছ তুমি?
ছেলেটা বোতল থেকে আরেক ঢোক পানি খেয়ে বলল, তাতে আপনার দরকার কী?
বর্ডারের দিকে যাচ্ছ?
ছেলেটা একটু অবাক হল, আমি ভেবেছিলাম অস্বীকার করবে কিন্তু করল না, মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।
কেন?
আমার ইচ্ছা।
আমি টের পেলাম সাহেবের মেজাজ গরম হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে সাহেব খপ করে ছেলেটার ব্যাগটা তুলে নিলো, এক নজর দেখল ভেতরে কী আছে, তারপর ব্যাগটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছেলেটার একটা হাত ধরে তাকে টেনে তুলে ফেলল।
ছেলেটা অবাক হয়ে তাকাল সাহেবের দিকে, তারপর ঝটকা মেরে ছুটিয়ে নিল নিজেকে।
সাহেব আবার তাকে ধরলো, এবার আরো শক্ত করে, তারপর বলল, চল আমার সাথে।
কোথায়?
পুলিশের কাছে।
পুলিশ? ভয় না পেয়ে ছেলেটা যেন অবাক হল একটু, পুলিশের কাছে?
হ্যাঁ।
কেন?
সাহেব সোজাসুজি কোনো উত্তর দিতে পারলো না, দাঁত কিড়মিড় করে বলল, সেটা পুলিশ দেখবে।
গোশত মাখন খেয়ে সাহেবের হাতে পায়ে মোষের মতো জোর, ছেলেটাকে প্রায় শূন্যে তুলে গাড়ির কাছে নিয়ে এল। গাড়ির দরোজা খুলে ধাক্কা মেরে ছেলেটাকে

ভেতরে ঢোকালো সাহেব, সিটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছেলেটা। পুরো ব্যাপারটায় এতো অবাক হয়েছে যে কোনো কথাই বলতে পারছে না। গাড়ির সিট থেকে সোজা হয়ে বসতে বসতে ছেলেটা সাহেবের বউকে দেখতে পেল। এরকম একটা মেয়ের সামনে তাকে এভাবে অপমান করছে, ছেলেটা নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বউটার মুখ দেখে মনে হল পুরো ব্যাপারটি দেখে লজ্জায় দুঃখে একেবারে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে। আরেকবার সাহেবের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, প্লীজ।

সাহেব বউয়ের দিকে না তাকিয়ে হাত জোরে জোরে নেড়ে ছেলেটাকে বলল, এখন বলো কেন তুমি বর্ডার ক্রস করতে যাচ্ছ? তোমার কাছে কোনো কাগজপত্র নাই, ঠিক উত্তর না দিলে তোমাকে পুলিশের হাতে দেব।

ছেলেটা সোজাসোজি খানিকক্ষণ সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলো, অসহ্য রাগে মনে হয় একবারে ফেটে পড়বে, একবার মনে হল লাফ দিয়ে পড়ে সাহেবের টুঁটি চেপে ধরবে, কিন্তু ধরলো না। আমি দেখলাম অনেক কষ্ট করে ছেলেটা নিজেকে শান্ত করলো। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে রেখে আস্তে আস্তে বলল, আপনি কোথাকার লাট সাহেব আমি জানি না। আমি কী করি না করি আমার ব্যাপার, আপনার বাবারও সেটা জানার দরকার নাই।

সাহেবের আজকে কপাল খারাপ। একজনের পর আরেকজন চ্যাংড়া ছেলে তাকে অপমান করে যাচ্ছে। আমি দেখলাম সাহেব রেগে ওঠার বদলে কেমন জানি বেকুব হয়ে গেল। ছেলেটা আবার বলল, আপনি আমাকে পুলিশের কাছে নিতে চাচ্ছেন নেন। কিন্তু মনে রাখবেন আপনি আমাকে গায়ের জোরে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি আমাকে চেনেন না, এই আমি বলে রাখলাম, আপনাকে আমি হাজতের ভাত খাওয়াব।

সে শালার যন্ত্রণা! কথাবার্তা শুনে বোঝা যাচ্ছে এই ছোকড়া চালু মাল। ভয় ডর তো নেই, উল্টো সাহেবকে ধাতানি দিচ্ছে! সাহেব মনে হয় ভুল জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে। এই ছেলে মনে হয় কোনো খুন খারাপি করে নাই—তবে অন্য ব্যাপার আছে।

সাহেবও মনে হয় ঘাবড়ে গেছে, একটু অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে। কী করবে বুঝতে পারছে না।

বউটা সাহেবকে রক্ষা করল। একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে সাহেবকে বলল, প্লীজ তুমি পাগলামি কর না, ওকে যেতে দাও। প্লীজ, তোমার পায়ে পড়ি।

সাহেব খানিকক্ষণ ওর বউয়ের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ছেলেটার দিকে তাকাল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ির দরোজা খুলে ছেলেটাকে বলল, ঠিক আছে তুমি যাও।

ছেলেটা বউটার দিকে তাকাল, মনে হল কিছু একটা বলবে, কিন্তু বলল না। নিচে

থেকে ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে নেমে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো। বউটা তখন আস্তে আস্তে বলল, আপনার পায়ের এই অবস্থা, আপনাকে আমরা নামিয়ে দিই?

ছেলেটা তার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, না, আমি হেঁটেই যেতে চাই। একটু থেমে যোগ করলো, আমাকে হেঁটেই যেতে হবে।

হেঁটেই যেতে হবে।

হ্যাঁ।

কেন?

কারণ, কারণ—ছেলেটা একটু ইতস্তত করে বলল, আমি একটা জিনিস করছি।

কী জিনিস?

ছেলেটা গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে থেমে গেল, একবার বউটার দিকে তাকাল, তারপর বলল, আমার মায়ের কি রকম কষ্ট হয়েছিল সেটা দেখতে চাইছি।

বউটা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছিল আপনার মায়ের?

মা মরে গেছে।

মারা গেছে? আহা! বউটার মনটা নরম, মুখটা একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, কবে?

অনেক দিন আগে, একাত্তর সনে, যুদ্ধের সময়।

ও। বউটা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না, কিন্তু আরো কিছু শোনার জন্য তাকিয়ে রইল।

ছেলেটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার মা এই রাস্তা দিয়ে আমাকে পেটে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা হিন্দু বলে আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল মিলিটারিরা। আমার মা বাবার হাত ধরে খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে গিয়েছিল এই পথ দিয়ে। শেষ কয়দিন শুধু শুকনো চিড়া খেয়েছিল পানি দিয়ে। বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়া যেতে চাইছিল, যেতে পারেনি। বিরইপুরের কাছে একটা গ্রামে আমার জন্ম হল, ডাক্তার নাই কিছু নাই, ব্লিডিং হয়ে মরে গেল আমার মা।

সাহেবের সাথে চোটপাট করে কথা বলছিলো দেখে ভাবছিলাম ছেলেটা বুঝি শক্ত। কিন্তু ছেলেটা শক্ত না, মনটা নরম। দেখতে পেলাম তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে, কোনোমতে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল, পারলো না। ঠোঁট কামড়ে বলল, মাকে কোনোদিন দেখি নাই। কোনো দিন দেখি নাই। কি কষ্টই না করেছে আমার মা! ইস্! না জানি কি কষ্ট করে এই রাস্তা দিয়ে ছুটে ছুটে গেছে আমার মা—ছেলেটা হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে বলল, আমি দেখতে চাই আমার মা কি রকম কষ্ট করেছিল, তাই শুধু একবার দেখতে চাই। শুধু একবার দেখতে চাই—

ব্যাগটা হাতে নিয়ে ছেলেটা সেই অবস্থাতেই নেমে গেল। একবারও পিছন দিকে

না তাকিয়ে সে হেঁটে যেতে থাকলো। বিরইপুরের দিকে যাচ্ছে, এখনো দশ মাইল। এভাবে হাঁটলে ঘণ্টা তিনেকে পৌছে যাবে। বিশ বছর আগে তার মা তাকে পেটে নিয়ে এদিক দিয়ে গিয়েছিল, কতক্ষণ লেগেছিল বেচারীর?

ছেলেটা এখনো কাঁদছে, সার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছতে চেষ্টা করছে সে। যে মাকে সে কোনোদিন দেখে নাই সেই মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে কাঁদছে।

গাড়ির ভেতরে আমরা চুপ করে বসে রইলাম। বউটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, মুখটা কাঁপছে, কাঁদছে নাকি? আহা বেচারী, মনটা বড় নরম। কাঁদুক একটু।

চা

শিরীন গত তিন মাসে এক কাপ চাও খায়নি। দেশ স্বাধীন হবার পর বাজার থেকে যে সব জিনিস উধাও হয়ে গেছে ভালো চা তার মাঝে একটা। কিন্তু শিরীনের চা না খাওয়ার কারণ সেটা নয়। শিরীনের বাবার অনেক মানুষের সাথে পরিচয়, তিনি খোঁজখবর করে ভালো এক প্যাকেট চা জোগাড় করে এনেছেন। শিরীন ইচ্ছে করলেই খেতে পারে, কিন্তু শিরীন তবু খায় না। সে খায় না তার কারণ সে খেতে পারে না। অনেকবার চেষ্টা করেছে কিন্তু সে একবারেই খেতে পারে না। ব্যাপারটা এখনো বাসার কেউ লক্ষ করেনি, শিরীন ইচ্ছে করেই সেটা গোপন রাখছে। সকাল বিকাল সে সবার সাথে চা নিয়ে বসে, মাঝে মাঝে চুমুক দেবার চেষ্টা করে। এক সময় কাপে চা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, তখন সে কাউকে না দেখিয়ে চা টা কোথাও ঢেলে ফেলে দেয়। এভাবেই চলে আসছে, শিরীনের ধারণা এভাবেই চলবে—সে আর কোনোদিন চা খেতে পারবে না।

ব্যাপারটি বেশ গুরুতর। যারা শিরীনকে জানে শুধু তারাই এর গুরুত্ব বুঝতে পারবে। শিরীন চা খেয়ে আসছে সেই চার বছর বয়স থেকে। প্রথম খেতো বাবার কাপের তলানিটুকু। বাবা ইচ্ছে করে একটু বেশি রেখে দিতেন তার জন্যে। দুষ্টুমি না করে ভালো হয়ে থাকলে মাঝে মাঝে বাসার বাচ্চাদের আধকাপ করে দুধ বহুল একধরনের চা দেয়া হত। শিরীন শুধু চায়ের লোভে বরাবর ভালো মেয়ে হয়ে থেকে এসেছে। তার বড় হওয়ার প্রধান আকর্ষণ ছিল যে সে নিজের ইচ্ছে মতো চা খেতে পাবে। বড় হয়ে সত্যি সত্যি সে চা খাওয়ার ব্যাপারটাকে মোটামুটি উপাসনার পর্যায়ে তুলে এনেছিল। অন্য কারো হাতে তৈরি চা সে খেতে পারতো না, চা তৈরি করার ব্যাপারটা তার কাছে ছিল প্রিয় শিল্পকলার মত। চা খাবার আগে সবার আগে সে টিপটটি ধুয়ে টেবিলে রাখতো। তারপর কেতলিতে মেপে পানি দিয়ে চুলার উপরে

বসিয়ে দিত। কখনোই সে কেতলির পানিকে বেশিক্ষণ ফুটতে দিতো না, এতে নাকী পানির ভেতরকার দ্রবীভূত বাতাসটুকু বের হয়ে পানি বিস্বাদ হয়ে যায়। যখন কেতলিতে পানি গরম হচ্ছে তখন সে টিপটে চায়ের চামুচে মেপে চায়ের পাতা ঢালত। তার প্রিয় চা ছিল দার্জিলিং এর সাথে সমান সমান সিলেটের চায়ের পাতা। দার্জিলিং চা দিত সুঘ্রাণ, সিলেটের চা থেকে আসতো রং। পানি ফুটে গেলে সে সাবধানে ফুটন্ত পানি ঢালতো টিপটে। তারপর চায়ের চামচে একটু চিনি নিয়ে সে টিপটের ফুটন্ত পানিটাকে ভালো করে একবার নেড়ে দিত। পানিতে একটু চিনি থাকলে চায়ের লিকারটি ভালো বের হয়—দুধ থাকলে হয় তার উল্টো, মোটে লিকার বের হতে চায় না। সব শেষ করে টিপটটি টিকুজি দিয়ে ঢেকে দিয়ে শিরীন ঘড়ি ধরে দুই মিনিট অপেক্ষা করতো। দু'মিনিট পর যখন চায়ের কাপে চা ঢালা হতো সব সময় সারা ঘর চায়ের মিষ্টি গন্ধে ভরে যেত। চায়ের জন্যে সে দুধও আগে তৈরি করে রাখতো। জ্বাল দিয়ে ঘন করে রাখা দুধ। গাঢ় লাল রংয়ের চায়ের মাঝে দু'চামচ দুধ দিয়ে নেড়ে দিতেই চায়ের একটা কোমল রং ফুটে উঠত সবসময়! তার মাঝে তখন সে দিত এক চামচ চিনি, বাজারের মোটা দানার ময়লা চিনি নয়, অনেক খুঁজে বের করা সূক্ষ্ম দানার ধবধবে সাদা চিনি। শিরীন চা খেত কারুকাজ করা পাতলা পোর্সেলিনের কাপে, অনেক সখ করে পয়সা জমিয়ে কিনেছিল সেই চায়ের কাপ। দুধের মতো সাদা কাপে হালকা নীল রংয়ের নকসা। শিরীন বসে বসে একবারে দুই থেকে তিন কাপ চা খেত, সাথে আর যারা থাকে তারাও, এতো ভালো চা এতো সুন্দর করে আর কে খেতে দেবে?

সেই শিরীন চা খেতে পারছে না ব্যাপারটা গুরুতর সন্দেহ কী, কিন্তু কিছু করার নেই। সে চায়ের কাপ হাতে নিলেই দেখতে পায় আঠারো কুড়ি বছরের একটি ছেলে মাছের মত নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টির সামনে তার সবকিছু ওলট পালট হয়ে যায়, সে চায়ের কাপ মুখে তুলতে পারে না। চেষ্টা করে দেখেছে কোনো লাভ হয়নি, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার, হঠাৎ করে মাথার মাঝে কেমন জানি করে ওঠে। এতো যন্ত্রণা সহ্য করার কোনো মানে নেই, শিরীন আজকাল আর চেষ্টাও করে না। ছেলে মেয়ে দুটিকে নিয়ে ভুলে থাকতে চেষ্টা করে।

ছেলেটা বড়, বয়স পাঁচ, ছোটটার বয়স তিন। ছোটটা মেয়ে যদিও তার মেয়েসুলভ কোনো হাবভাব নেই। সে বড় ভাইকে অন্ধের মতো অনুকরণ করে এবং দিনের বেশির ভাগ সময় একটা খেলনা বন্দুক নিয়ে অনুগত ভৃত্যের মত তার পিছনে পিছনে ঘুরতে থাকে। তাদের খেলার বিষয়বস্তু বিশেষ সরল, একটা কোল বালিশকে লাথি মেরে মেরে ঘরের এক কোণা থেকে আরেক কোণায় নিয়ে যাওয়া। আপাতদৃষ্টিতে বালিশটিকে বৈশিষ্ট্যহীন মনে হলেও তাদের কাছে সেটি হচ্ছে বদরবাহিনী। কাজেই খেলার শেষে সবসময়েই এই দুর্ভাগা বালিশটি দু'জনের হাতে শোচনীয়ভাবে প্রাণ ত্যাগ

করে। সম্ভবত এই বয়সী বাচ্চাদের জন্যে এটি সঠিক খেলা নয়, কিন্তু কিছু করার নেই। যুদ্ধের সময় প্রতিদিন মানুষ মারার কথাবার্তা শুনে শুনে এরা খুন খারাপির ব্যাপারটি বেশ সহজভাবেই নিচ্ছে। শিরীন আশা করে আছে কয়দিন পর এই খেলার আকর্ষণ কমে আসবে, এক খেলা মানুষ আর কয়দিন খেলতে পারে?

বেলা তিনটার দিকে পিয়ন চিঠি নিয়ে আসে। বাসায় এতোগুলো মানুষ, রোজই কারো না কারো জন্যে কিছু একটা থাকে। আজকাল শিরীনও চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে, বিভিন্ন জায়গায় চাকরির জন্যে লেখালেখি শুরু করেছে কোনো উত্তর আসছে কিনা দেখতে চায়। বাসার সবাই তার চাকরির চেষ্টাটাকে একটা কৌতুক হিসেবে নিচ্ছে। পরিচিত মানুষকে ধরাধরি না করে শুধু চিঠি লিখে যে চাকরি পাওয়া যায় না এই সহজ জিনিসটা শিরীন এখনো স্বীকার করে নেয়নি, কৌতুকটা সেখানে। তাছাড়াও বাবার বাসায় উঠে আসার ব্যাপারটাকে শিরীন সহজভাবে না নিয়ে চাকরির চেষ্টা করছে, সেটাও সবার জন্যে খানিকটা মনোকষ্টের কারণ। সেটাকেও কৌতুকের ভান করে নিজেদের মাঝে আড়াল করে রাখা হয়।

শিরীন যখন তার চিঠি পড়া শুরু করেছে তখন তার ছেলে টোপন এবং পিছনে পিছনে অনুগত ভৃত্যের মত তার মেয়ে শাওন এসে হাজির হল। টোপন বলল, আম্মা, বড় মামা বলেছে তোমার মাথা খারাপ।

টোপন যেটা বলে শাওনও সবসময় সেটা বলে, কাজেই সেও বলল, তোমার মাথা খারাপ, আম্মু।

শিরীন চিঠি থেকে চোখ না তুলে বলল, ঠিক আছে।

এরকম বড় একটা জিনিস এতো সহজে মেনে নিলে ব্যাপারটার মজা নষ্ট হয়ে যায়। টোপন তাই আবার চেষ্টা করল, তোমার কেন মাথা খারাপ আম্মা?

শাওন কৌতূহলী হয়ে বলল, দেখি আম্মা তোমার মাথা, দেখি—

শিরীন বলল, এখন জ্বালাতন কর না। যাও। দেখছ না, আমি চিঠি পড়ছি?

টোপন এবারে অন্যভাবে চেষ্টা করল, বলল, বড় মামা বলেছে কোনোদিন তোমার চিঠি আসবে না।

শাওন মাথা নেড়ে যোগ করল, আসবে না, কখনো আসবে না।

শিরীন বলল, ঠিক আছে এখন ভাগ এখান থেকে।

টোপন তবুও শিরীনের কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে থাকে। একটু পর ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, আম্মা, তুমি কেন চাকরি করতে চাও? আম্মারা তো কখনো চাকরি করে না।

শাওন এই প্রসঙ্গে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, গলা উচিয়ে ঝাকিয়ে বলল, কখনো করে না কখনো করে না।

শিরীন আড়চোখে দুজনকে একটু দেখে বলল, তোর আব্বা বলেছে আমার চাকরি করতে হবে। মনে আছে?

টোপন প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। আব্বার কথার উপরে কোনো কথা হয় না। আব্বা যদি বলে থাকে আম্মার চাকরি করতে হবে তাহলে তো করতেই হবে। টোপন তার মুখে বয়সের তুলনায় বেমানান একটা গাম্ভীর্য এনে বলল, শাওন।

কী?

আব্বা বলেছে আম্মার চাকরি করতেই হবে।

কিন্তু বড় মামা বলেছে আম্মার মাথা খারাপ।

শিরীন হাসি গোপন করে বলল, আমার তো শুধু মাথা খারাপ, তোর বড় মামার কি খারাপ জানিস?

কী?

তোর বড় মামার চোখ খারাপ, নাক খারাপ, গলা খারাপ, পেট খারাপ—সবকিছু খারাপ।

কথাটি এমন কিছু হাসির কথা নয়, কিন্তু বাচ্চাদুটি এটি শুনে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকে। কোন্ কথায় কতটুক হাসা যায় সে ব্যাপারে ছোটদের এবং বড়দের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই আলাদা। অনেক কষ্ট করে হাসি থামিয়ে শাওন শিরীনের কাছে এসে বলল, আম্মু আবার বলো দেখি বড় মামার কি খারাপ—

শিরীন আবার অঙ্গভঙ্গি করে বলল, বড় মামার চোখ খারাপ, নাক খারাপ, গলা খারাপ, পেট খারাপ—সবকিছু খারাপ!

আবার দু'জনে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটোপুটি খেতে থাকে। ব্যাপারটি শিরীনের বড় ভাই রাজুর জন্যে ভালো হল না। এখন থেকে কে জানে কতদিন পর্যন্ত তাকে একটু পরে পরে এই অর্থহীন হাস্যকর কথাটি শুনে যেতে হবে।

টোপন শাওনকে নিয়ে বড় মামার খোঁজে চলে যাবার পর শিরীন চিঠিটা আরেকবার পড়ল। চিঠিতে উৎসাহব্যঞ্জক বিশেষ কিছু নেই। কে জানে হয়তো বাসার অন্য সবার কথাই ঠিক সত্যিই হয়তো ধরাধরি না করে চাকরি পাওয়া যায় না। সে অবশ্যি এতো সহজে হাল ছেড়ে দেবে না, টোপন শাওনের বাবা ধরাধরি জিনিসটা দু'চোখে দেখতে পারত না।

শিরীন খাবার টেবিলে কাগজ কলম নিয়ে চিঠির উত্তর লিখতে বসল। খানিকটা লিখেছে তখন মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবি এক কাপ?

শিরীন অন্যমনস্কভাবে বলল, না।

মা বলল, আজকাল দেখি একেবারে চা খেতে চাস না।

শিরীন মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ইচ্ছে করে না মা।

গলার স্বরে কিছু একটা ছিল, মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে গেলেন।

সারাদিন কোনো না কোনোভাবে কেটে যায়, কিন্তু রাতটা আর কাটিতে চায় না। সন্ধ্যে হবার পরই কেমন জানি মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। বাসার সবাই চেষ্টা করে তাকে হাসিখুশি রাখতে। বাচ্চা দুটিকে নিয়ে নতুন নতুন খেলা আবিষ্কার করা হয়, সবাই মিলে বই দেখে রান্না করা হয়, বাবা কখনো কখনো 'বরযাত্রী' পড়ে শোনান। সবার সাথে যতক্ষণ থাকে শিরীন চেষ্টা করে হাসিখুশি থাকতে, কিন্তু যখন নিজের ঘরে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে শুতে আসে মনে হয় বুকটা বুঝি ভেঙে যাবে। দশ বছর ঘর করেছিল মানুষটার সাথে সেই মানুষটা আর কখনো ফিরে আসবে না, শিরীন কেমন করে সেটা মেনে নেয়?

শাওন সারাদিন হৈ চৈ করে এত ক্লান্ত হয়ে থাকে যে বিছানায় শোওয়ানোর পর 'আমি এখন ঘুমাবো না— ঘুমাবো না',—বলে বার কয়েক মাছের মত লাফ দিয়ে প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে যায়। টোপন বড় হয়েছে সে অপেক্ষা করে শিরীনের জন্য। কেমন করে জানি বুঝতে পারে মায়ের মন খারাপ, চেষ্টা করে ভুলিয়ে রাখতে। মায়ের মন ভালো করার জন্যে পৃথিবীর এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই যা নিয়ে কথা বলে না, শুধু ভুলেও কখনো বাবার কথা তোলে না। ছোট বাচ্চারা এতো বুঝতে পারে কেমন করে কে জানে?

টোপনকে বিছানায় শুইয়ে শিরীন চিরুনি দিয়ে চুল ঠিক করছিল। দীর্ঘদিনের অভ্যাস, ঘুমানোর আগে চুল শক্ত করে না বেঁধে শুতে পারে না। সেই ছেলেবেলায় মা বলেছিলেন ঘুমানোর সময় শক্ত করে চুল বেঁধে শু'লে চুল বড় হয়, সেই থেকে তাই করে আসছে। টোপন আর শাওনকে দুই কোলে নিয়ে নুরুল তার চুল ঠিক করা নিয়ে কতই না হাসাহাসি করত! মানুষটার কথা মনে পড়ে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিরীন, মানুষ মরে গেলে কী হয় কেউ কি বলতে পারে? কিছু কী হয় সত্যি?

মা এক কাপ চা নিয়ে ঢুকলেন, টেবিলে রেখে বললেন, শিরীন খেয়ে দেখ তো চা টা কেমন। রাজু এনেছে, দার্জিলিং চা নাকি।

শিরীন বলল, টেবিলে রেখে দাও মা, খাবো।

টোপন মশারির ভেতরে থেকে বলল, নানু, বড় মামা চা এনেছে?

হ্যাঁ।

নানু তাহলে তো এই চা খাওয়া যাবে না।

কেন গো সোনা।

তুমি জান না, বড় মামার চোখ খারাপ, নাক খারাপ, গলা খারাপ, পেট খারাপ-সবকিছু খারাপ। কথা শেষ করার আগেই টোপন অট্টহাসি দিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি

দিতে থাকে। আজ সারাদিনে বাসার সবাই অজস্রবার দু'জনের মুখ থেকে এই অর্থহীন কথাটি শুনে এসেছে কিন্তু তবুও মা টোপনের সাথে হাসিতে যোগ না দিয়ে পারলেন না। যদি সুচিন্তিত অর্থবহ কথাতেই মানুষকে হাসতে হবে তাহলে হাসির জিনিস আর কয়টা থাকবে পৃথিবীতে?

মা চায়ের কাপ টেবিলে রেখে চলে গেলেন। কাপে চা ঠাণ্ডা হতে থাকে। শিরীন একদৃষ্টে চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে থাকে, আবার পুরো ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়। ডিসেম্বরের বারো তারিখ ছিল সেদিন। রাত দশটার মত বাজে, বাচ্চারা, সকাল সকাল ঘুমিয়ে গেছে তাই বসে চা খাচ্ছিল ওরা। দরজায় শব্দ হল তখন। নুরুল খুলে দেখে তার এক ছাত্র। অবাক হয়ে বলল, বারেক! কী ব্যাপার?

ছেলেটার গায়ে চাদর জড়ানো, মুখে হালকা দাড়ি। চোখের দৃষ্টি মাছের মত, নিষ্পলক। সালাম দিয়ে বলল, স্যার আপনি একটু আসতে পারবেন।

কোথায়?

আমার সাথে।

কেন?

ছেলেটা একটু ইতস্তত করে বলল, কয়েকজন মানুষকে আইডেন্টিফিকেশান করার জন্যে।

নুরুল কেমন জানি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে গেল। চারদিকে নানারকম গুজব, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসারদেরকে জামায়াতে ইসলামীর লোকজন, আল বদরেরা নাকি ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এও কি তাদের দলের কেউ? ছেলেটা হেসে বলল, বেশিক্ষণ লাগবে না স্যার, মাত্র আধাঘণ্টা।

ঠিক আছে চল।

শিরীন বলল, চা-টা শেষ করে যাও। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি খাবেন এক কাপ?

ছেলেটার মাছের মতো চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিরীন দেখল চোখে হালকা সুরমা দিয়েছে এই ছেলে। হাত ঘষে বলল, দেন একটু। বাইরে যা ঠাণ্ডা।

শিরীন টিপট থেকে এক কাপ চা ঢেলে দিল ছেলেটাকে।

ছেলেটার সাথে নুরুল বের হয়ে যাবার পর দরজা বন্ধ করে চায়ের কাপগুলো তুলতে গিয়ে শিরীন দেখল ছেলেটা তার চা স্পর্শ করেনি, কাপে পুরো চা রয়ে গেছে। কী কারণ কে জানে হঠাৎ করে বুকটা ধ্বক্ করে উঠে শিরীনের।

ষোলো তারিখ মিলিটারিরা সারেন্ডার করল রেসকোর্সে। নুরুলকে পাওয়া গেল

আঠারো তারিখ রায়ের বাজারের বিলে। হাত পিছনে বাঁধা, মাথায় আর বুকে গুলি। প্রফেসার রায়হানও ছিলেন সেখানে, ডক্টর ইদ্রিসও। আরো অনেকে। সবাইকে শিরীন চেনে না। নুরুলকে তুলে এনে কবর দিল বাসার লোকজন, শিরীনকে দেখতে দিল না। কতদিন পড়েছিল বিলে কে জানে, সুপুরুষ একটা মানুষ মরে গেলে কত তাড়াতাড়ি না বিকৃত হয়ে যায়।

শিরীন লক্ষ করল তার শরীর অল্প অল্প কাঁপছে। কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে সে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বাথরুমের বেসিনে পুরোটা ঢেলে ফেলে দিল। খালি কাপ নিয়ে শোওয়ার ঘরে ফিরে আসতেই মশারির ভেতর থেকে টোপন ডাকলো, আম্মা।

কী বাবা?

তুমি সবসময় চা না খেয়ে ফেলে দাও কেন?

শিরীন ছেলের দিকে তাকাল। আর কেউ ধরতে পারেনি, কিন্তু এইটুকু ছেলে ঠিক ধরে ফেলেছে। কী উত্তর দেবে শিরীন?

কেন ফেলে দাও?

নুরুল সবসময় বলতো বাচ্চাদের কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। লোকটা মরে গেছে, তার কথা রাখবে শিরীন, টোপনকে সত্যি কথাই বলবে। বিছানায় উঠে গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, আমার আর চা খেতে ভালো লাগে না।

কেন?

তোর আব্বুকে যে লোকটা নিয়ে মেরে ফেলেছিল তাকে আমি এক কাপ চা দিয়েছিলাম। লোকটা সে চা'টা খায়নি। সেই থেকে চা দেখলেই আমার সেই লোকটার কথা মনে পড়ে। আমি আর চা খেতে পারি না।

টোপন দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে বড় মানুষের মতো বলল, ও।

শিরীন টের পাচ্ছিল তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে, অনেক কষ্ট করে আটকে রাখল সে। টোপনের সামনে কাঁদতে চায় না কিছুতেই। খানিকক্ষণ দু'জন চুপ করে বসে রইল তারপর টোপন আস্তে আস্তে বলল, আম্মা।

কী বাবা।

আব্বু তোমাকে যেভাবে ধরে রাখত আমি সেভাবে তোমাকে ধরে রাখব?

রাখ বাবা।

টোপন দুই হাত দিয়ে শক্ত করে শিরীনকে জড়িয়ে ধরে।

হে ঈশ্বর, পৃথিবীর মানুষের জন্যে তুমি এত দুঃখ কেন তৈরি করেছিলে?

বেড সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিতেই মেঝেতে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়ল। জোছনার কোমল আলো এমনিতে চোখে পড়ে না, সেটা চোখে পড়ে যখন সব আলো নিভে যায় তখন।

ফেরা

বাসের ইঞ্জিনটা বেশ কিছুক্ষণ থেকে মাঝে মাঝে একটা বিকট শব্দ করে উঠছিল, এবারে বার কয়েক খিচুনি দিয়ে সেটা একবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ড্রাইভার কোন লাভ নেই জেনেও শুধু অভ্যাসের দোষে বার কয়েক চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিনটা চালু করার চেষ্টা করে দেখল, কোন লাভ হল না। রুমী বাসের ছাদে পা ঝুলিয়ে আরাম করে বসেছিল, নিচে তাকিয়ে দেখল বাসের হেল্পার একটা ভাঙা বালতি নিয়ে প্রাণপণে পাশের ডোবার দিকে ছুটে যাচ্ছে। এক বালতি পানি এনে বাসের হুড খুলে রেডিয়েটরে ঢালা মাত্র সাদা ধোঁয়া বের করে পানি সেখানে টগবগ শব্দ করে ফুটতে থাকে। কে জানে ডোবা থেকে পানির সাথে কোনো ব্যাঙের বাচ্চা উঠে এসেছে কিনা, তাহলে এতোক্ষণে নিশ্চয়ই সেদ্ধ হয়ে গেছে। ড্রাইভার দরোজা খুলে বের হয়ে অত্যন্ত বিরস মুখে বাসের ইঞ্জিনটার দিকে তাকিয়ে থাকে। উপর থেকে একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, ড্রাইভার সাব, বাস আর যাবে না?

ড্রাইভার যেন এতোক্ষণ ঠিক এই প্রশ্নটার জন্যে অপেক্ষা করেছিল। মুখটা খিচিয়ে বলল, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? যারা বাসটাকে নামিয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করেন না কেন?

যারা বাসটাকে ড্রাইভারের প্রবল আপত্তি না শুনে জোর করে রাস্তায় নামিয়েছে তাদের খুব একটা বিচলিত হতে দেখা গেল না। একজন পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, আরে ড্রাইভার সাহেব, রাগেন কেন? কতদিন দেশের বাইরে জানেন? আপনারা না আনলে আনবে কে?

ড্রাইভার সাথে সাথে মুখ নরম করে ফেলে, তার মেজাজ খারাপ হতে পারে কিন্তু সে এখনো বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়নি। যারা তাকে জোর করে বাসটাকে রাস্তায় নামিয়েছে তারা

সবাই মুক্তিবাহিনীর ছেলে, রেসকোর্সে নিয়াজীর সারেন্ডার দেখে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, কথা স্যার আপনারা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু ইঞ্জিনটার অবস্থা খুব খারাপ কিনা। রেডিয়েটরে লিক। কে জানে শালার চেসিসটা খুলেই গেল কি না। এইটুকু বাসে কতজন উঠেছে দেখেছেন?

আপনি তো বলছিলেন এই বাস এক মাইলও যাবে না। চল্লিশ মাইল নিয়ে এসেছেন কিনা?

ড্রাইভার কানের উপর থেকে তার আধখাওয়া সিগারেটটা নিয়ে আগুন ধরাতে ধরাতে বলল, স্যার সেইটাই তো মুশকিল। এক মাইল পরে নষ্ট হলে মেকানিক নিয়ে আসা যেত। এখন মেকানিক পাই কই?

বাসটার এখন কী গতি হবে কে জানে? বাসের যাত্রীদের সেটা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা দেখা গেল না। তারা ধীরে সুস্থে বাস থেকে নামতে থাকে, একজন পয়সা ফেরত চাইবে কী না বুঝতে পারছিল না। ছেলেদের একজনকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, আপনার পাছায় কি ড্রাইভার তেল মালিশ করেছিল বাসে ওঠার জন্যে? ইঞ্জিনের বারোটা বাজানোর জন্য ডবল পয়সা দেয়ার কথা আপনার, এইটুকু বাসে এতগুলো মানুষ ওঠে কখনো?

লোকটা হাসিমুখে ছেলেটার এই কটুক্তি সহ্য করে তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে যায়। কে জানে সত্যি যদি ডবল পয়সা দাবি করে বসে। আজকাল তো ওদেরই দিন, ওরা যেটা বলে সেটাই তো হয়। সেটাই অবিশ্যি হওয়ার কথা। ওরা যখন মিলিটারির ভয়ে জংগলে লুকিয়ে কাপড়ে পেচ্ছাব করে দিচ্ছিল তখন এরাই তো মেশিনগান হাতে নিয়ে মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করেছে। এই রাস্তা দিয়ে বাসের ছাদে বসে গল্প করতে করতে যেতে পারবে কখনো ভেবেছিল কেউ?

রুমীও বাসের ছাদ থেকে নামল। একটা মাত্র কাপড়ের ব্যাগ সাথে, ভেতরে বেশি কিছু নেই, একেবারে হালকা। একবছর আগে হলে কী ঘাবড়ে যেতো সে, কোথায় এল, কোথায় যাবে কী করবে কত কী চিন্তা। যুদ্ধের নয় মাসে একটা লাভ হয়েছে, কোন কিছুই আর সমস্যা মনে হয় না, বেঁচে থাকলেই হল।

রুমী সাথের ছেলেগুলোকে জিজ্ঞেস করল বাকি পথটুকু কিভাবে যাওয়া যায়। বাসের ছাদে পরিচয় হয়েছে, বয়সে ছোট বলে রুমীকে বড় ভাই ডেকে সিগারেট ধরাবার আগে, "কিছু মনে করবেন না বড় ভাই" বলে অনুমতি নিয়েছি। তাদের কাছে শুনলো মাইল দুয়েক দূরে একটা ভাঙা ব্রীজ রয়েছে বাসটা নষ্ট না হলে বড়জোর তার কাছে যেতে পারত। এরপর বাকি রাস্তা হেঁটেই যেতে হবে। ব্রীজটা নাকি তাদের দলের লোকই উড়িয়েছিল মিলিটারির একটা ট্রাকসহ। তারপর দুপাশের গ্রামের এই অবস্থা। রুমী আগে খেয়াল করেনি, বলার পর তাকিয়ে দেখে যতদূর দেখা যায় শুধু পোড়াবাড়ি,

একটা আস্ত বাড়ি নেই। বেশি মানুষ নাকী মারতে পারেনি, গ্রামের লোক আগেই সরে পড়েছিল।

রুমীর এখনো কুড়ি মাইলের মত যেতে হবে। ট্রেনের লাইন ধরে হেঁটে যাওয়াটা সবচেয়ে সহজ। মিলিটারি ফিরে যাবার আগে সবগুলো ব্রীজ ভেঙে দিয়ে গেছে কাজেই ট্রেন শুরু হওয়ার এখনো অনেক দিন বাকি। ঘণ্টায় চার মাইল হিসেবে কুড়ি মাইল যেতে পাঁচ ঘণ্টার মত লাগার কথা রুমী অবিশ্যি হাঁটবে ধীরে সুস্থে, কাজেই ধরা যাক তার লাগবে ছয় থেকে সাত ঘণ্টা। পথে খাওয়ার জন্যে কোথাও থামতে হবে, তাছাড়া ভাঙা ব্রীজগুলো পার হতে একটু সময় লাগবে। ধরা যাক আরো এক ঘণ্টা। সব মিলিয়ে বড়জোর আট ঘণ্টা। এখন বিকেল চারটা বাজে, তার মানে রাত বারোটার আগে বাড়ি পৌঁছে যেতে পারবে।

ছেলেগুলো তাদের সাথে রাত কাটিয়ে ভোরে রওনা দিতে বলল, তারা সবাই স্থানীয় ছেলে আশেপাশেই থাকে। রুমী রাজি হল না বাড়ির এত কাছে এসে আর ওর অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই। গত নয়মাস সে এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করেছে, এখন আর অপেক্ষা করা যায় না। ছেলেগুলোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে হাঁটতে থাকে। বাসের সবাইও এর মাঝে হাঁটতে শুরু করেছে। একজন দু'জন এখনো বসে আছে রাস্তার পাশে, কী করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না মনে হয়।

এদিকে দেখা যাচ্ছে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর সোয়েটারগুলো দেখতে জঘন্য কিন্তু গরম আছে। ডিসেম্বর নিশ্চয়ই বাংলায় মাঘ মাস, ঠাণ্ডা পড়ারই কথা। আজ সতের তারিখ, গতকাল মাত্র রেসকোর্সে মিলিটারিরা সারেন্ডার করেছে অথচ মনে হচ্ছে সেটা যেন কতকাল আগের ঘটনা। রুমীর অবাক লাগে গত কালকের ঘটনাকে মনে হচ্ছে কত আগের ঘটনা অথচ নয়মাস আগে যখন ওরা কয়জন পালিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছিল সেটাকে মনে হচ্ছে সেদিনের ঘটনা। সব স্পষ্ট মনে আছে ওর। আগরতলা পৌঁছে তারিকের কী বমি, সবাই ভাবল কলেরা হয়ে গেছে। কী ভয়ই না পেয়েছিল বেচারা তারিক! আসলে বেশি পরিশ্রমে শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল, একবেলা বিশ্রাম নিতেই সব ঠিক হয়ে গেল।

রুমী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নীলগঞ্জ থানা দখল করে ওরা দেখে লাইট মেশিন গানটার উপর মাথা রেখে তারিক শুয়ে আছে, প্রচণ্ড গোলাগুলোর ভেতর কখন মারা গেছে কেউ জানে না। গোঁফ রেখেছিল তারিক, ওর গোঁফ দেখে ওর বোনেরা কী বলবে খুব জানার কৌতূহল ছিল। করিমপুরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে একটা ফটোগ্রাফারের স্টুডিও। রাত বারোটার সময় ফটোগ্রাফারের বাসায় গিয়ে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলিয়ে এনে ছবি তুলেছিল তারিক। দু ঘণ্টা বসে থেকে রাতেই ডেভেলপ

করিয়েছিল ছবি। এক হাতে স্টেন গান আরেক হাতে একটা গ্রেনেড, সে নিজে মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে একটা সিনেমার ভিলেনদের মত হাসি। একেবারে ছেলেমানুষ ছিল তারিক, রুমী অবাক হয়ে ভাবে অথচ কী ঘাঘু জেনারেলের মত যুদ্ধের পরিকল্পনা করত! কার ভেতরে কি রয়েছে কে বলতে পারে? বেচারা তারিক আজ বেঁচে থাকলে যে কী করত কে জানে? রুমীর চোখে পানি এসে যেতে চায়, জোর করে চিন্তাটা সরিয়ে নিজের বাড়ির কথা ভাবে সে। সবাই যে কী অবাক হবে ওকে দেখে! সে মাসের শেষে একজনকে দিয়ে সে খবর পাঠিয়েছিল বাড়িতে যে সে ভালো আছে। যে ছেলেটা খবর নিয়ে গিয়েছিল সে এসে তার সাথে দেখা করেছিল। ওর বাবা নাকি খুব রেগে আছেন তার উপর। রুমীর একটু হাসি পায়, ওর বাবা বরাবরই এরকম, যখনই কোনকিছু নিজের হাতের বাইরে চলে যায় তিনি রেগে যান। বেশিদিন স্কুলে মাস্টারি করে এরকম অবস্থা হয়েছে। ওর মা নাকি বলেছেন একবার এসে দেখা করে যেতে। রুমী যেন আর বুঝে না, মা মনে মনে ভাবছিলেন একবার এলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে দেবেন। মা বাবারা সব সময়েই ভাবে ছেলেরা বুঝি সেই ছোটটিই আছে তারা যেটা বোঝাবেন সেটাই বুঝবে! বিলু, রুনু আর নীমার কী খবর কে জানে? এতদিন সব স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল নিশ্চয়ই ঘরে বসে বসে শুধু লুডু খেলেছে। জোর করে স্কুল কলেজ কি খুলেছিল এক আধদিন? ঢাকাতেই পারেনি আর এই গ্রামে গঞ্জে কি পারবে? বিলুর যে বয়স মনে হয় প্রত্যেকদিন ঘুরে ঘুরে গরম খবরগুলো এনে হাজির করত, কোথায় কয়টা মিলিটারি শেষ হয়েছে, কোন থানা দখল হয়েছে, কোন ব্রীজ উড়েছে এসব। কে জানে স্বাধীন বাংলা রেডিও শুনেছে কিনা তারা, যেদিন নীলগঞ্জ থানা দখল করেছিল খবরটা অনেক বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলেছিল রেডিওতে। তাদের কয়েকজনের সাক্ষাতকারও নিয়েছিল, সেগুলো রেডিওতে শুনেছিল কিনা কে জানে। তাদের নাম অবিশ্যি বলেনি, কিন্তু গলার স্বর শুনে কি চিনতে পারবে না? রেডিওতে গলার স্বর তো আর পরিবর্তন হয় না।

বাবা কই যান বাবা আপনি?

রুমীর প্রায় সাথে সাথে বুড়ো মতন যে লোকটি হাঁটছিল সে তার সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টা করছে।

পলাশপুর।

পলাশপুর? সেটা তো অনেক দূর বাবা।

হ্যাঁ, এখনো বিশ মাইল।

লোকটি হাঁটতে হাঁটতে তাকে বার কয়েক দেখে জিজ্ঞেস করল, বাবা, আপনি যুদ্ধ করেছেন?

রুমী একটু হেসে বলল, হ্যাঁ করেছি।

পাকবাহিনী কি মেরেছেন নিজের হাতে?

মিলিটারিকে বেশকিছু লোক পাক-বাহিনী বলে। কেন বলে কে জানে? রুমী বলল, সামনা সামনি তো মারি নাই। কিন্তু যুদ্ধের মাঝে কি আর আর মরে নাই। নিশ্চয় মরেছে।

লোকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বলল, আপনাগো অনেক সাহস বাবা।

রুমী চুপ করে থাকল। অনেকবার শুনেছে সে এই কথা, তাদের নাকি অনেক সাহস। সত্যিই কি তাদের অনেক সাহস? মোটেও না। যুদ্ধটা একটা খেলার মত, মানুষের জান নিয়ে খেলা হয়। সেই খেলাকে ভয় পাবে না এরকম মানুষ কয়জন আছে? একেবারে নাই তো নয় কিছু আছে কিন্তু তারা পাগল মানুষ, তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা দরকার। প্রথম প্রথম তার ভয়ে কোন বিচার বুদ্ধি থাকত না, একটা ঘোরের মাঝে অপারেশানে যেত, ফিরে আসত ঘোরের মাঝে। আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে শিখেছে। প্রচণ্ড বিপদের মুখেও মাথা ঠাণ্ডা থাকত, ভয় পেত কিন্তু ভয় পেয়েও মাথা ঠাণ্ডা রাখত। একবার একটা ছোট রাস্তা পার হতে গিয়ে আবিষ্কার করল কিভাবে খবর পেয়ে সেখানে ভারী মেশিনগান নিয়ে মিলিটারি অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল বলে সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল সেবার। ধান ক্ষেতে মাথা গুজে শুয়ে আছে পানির মাঝে, মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টির মত গুলি যাচ্ছে। কী সাংঘাতিক ইচ্ছা হচ্ছিল তার উঠে ছুটে যেতে, তবু সে মাথা গুজে শুয়েছিল তিন ঘণ্টা। সেটাই হয়তো সাহস, যেখানে ভয় পাওয়ার কথা সেখানে ভয় পাওয়া, কিন্তু ভয় পেয়েও মাথা ঠাণ্ডা রাখা। ভয় পেয়েও মানুষের জান নিয়ে খেলা। রুমী মুখ টিপে হাসল, বিলুকে যুদ্ধের গল্প বলতে হবে। গল্প শুনতে এত পছন্দ করে বিলু। চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যায় কখনো কখনো।

রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকান দেখে রুমীর হঠাৎ চা খাবার ইচ্ছে হল। কাচের বয়ামে বিস্কুট কেক সাজানো। রুমী বেঞ্চে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, একটা চা দেন দেখি ভাই।

একজনই মানুষ, সে-ই চা বানায় সে-ই পরিবেশন করে, আবার সে-ই বিড়ি সিগারেট বিক্রি করে। রুমীর জন্যে সে নতুন পাতা দিয়ে চা তৈরি করে, ফুটন্ত পানি দিয়ে কাপ পিরিচ ধোয়া শুরু করে। এটা বাড়তি সমাদরের লক্ষণ। চা দিয়ে লোকটা চলে গেল না, কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। চায়ে চুমুক দেবার পর জিজ্ঞেস করল, লিকার ঠিক আছে স্যার?

আছে।

চিনি?

আছে।

দুধ লাগবে আরেকটু?

না।

লোকটা দাঁত বের করে একটু হেসে বলল, এখন দেশটারে আবার দেশের মতন লাগে।

কী রকম?

এই নয়টা মাস গেল কোন কম বয়সী ছেলে নাই। শুধু বুড়া আর বুড়া। এখন দেখেন চারদিক কত কম বয়সী ছেলে।

রুমী তাকিয়ে দেখে সত্যিই তাই। চায়ের দোকানেই বেশ কয়জন তরুণ। রাস্তা দিয়ে যারা হাঁটছে বা গল্প করছে তাদের মাঝে কম বয়সী ছেলেই বেশি। দুদিন আগেও কম বয়স হওয়াই এদেশে একেবারে মৃত্যুদণ্ডের অপরাধ ছিল। শুধু কম বয়স হওয়ার জন্যে এদেশে কতজন মানুষ মারা গেছে তার হিসেব কী কেউ বের করতে পারবে? এক লক্ষ পাকিস্তানি সৈন্য ধরা পড়েছে, এর মাঝে বের করবে কেমন করে কোন্‌টা কী রকম খুনী? শাস্তিটা দেবে কেমন করে? কোন্‌টা যদি ছাড়া পেয়ে যায় কোনভাবে?

রুমীর হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়, চায়ে চুমুক দিতে মনে থাকে না, নতুন পাতার তৈরি চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার উপক্রম হয়। বাইরে তখন খুব ধীরে ধীরে অন্ধকার নামছে। রুমীর বিশ্বাস হতে চায় না এই অন্ধকারে কোন বিপদ গুড়ি মেরে নেই, এখন দেশ স্বাধীন, সে ইচ্ছে করলেই রাস্তায় চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে যেতে পারবে, কেউ ওকে গুলি করে মেরে ফেলবে না।

রাত দশটার দিকে রুমী নবীগঞ্জে পৌছল। এখানে মেল ট্রেন থামে এরপর দুটি ছোট ছোট স্টেশন, তারপর তাদের পলাশপুর। স্টেশন থেকে তাদের বাসা দশ মিনিটের রাস্তা। আকাশে চাঁদ নেই, তারার আলোতে রাস্তাটা শুধু আবছা দেখা যায়। শীতের রাতে নরম ধুলায় পা ডুবিয়ে হাঁটতে মন্দ লাগে না। প্রায় পনের মাইল হেঁটে এসেছে কিন্তু সেরকম ক্লান্তি লাগছে না। কি ভারি একটা বোঝা নিয়ে না খেয়ে ঘুমিয়ে কাঁদার মাঝে ছপ-ছপ করে হাঁটতে হত, তার তুলনায় এত কিছুই নয়।

হল্ট।

অন্ধকারে কে যেন চিকন গলায় তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ওঠে। উচ্চারণ বেশি সুবিধের নয়, শব্দটা যে 'হল্ট' সেটাও প্রথমে সে বুঝতে পারে না।

এক পা নড়লে গুলি।

রুমি নড়ে গুলি খাওয়ার চেষ্টা করল না। ব্যাপারটা কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করল। একটা টর্চের আলো তার মুখে এসে পড়েছে, আলোটা সারা শরীর ঘুরে পা হয়ে আবার মুখে গিয়ে স্থির হল। রুমী চোখ কুচকে পিছনের মানুষটিকে দেখতে চেষ্টা করল।

কে যায়?

রুমি বলবে না বলবে না করেও বলে ফেলল, তোমার বাবা।

কী? বাচ্চা গলার একটা বিস্ময় ধ্বনি শোনা গেল। একটা রাইফেল তাক করে

রাখার পরও কেউ এরকম কথা বলতে পারে ছেলেটার বিশ্বাস হয় না। রুমী ছেলেটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল, টর্চের আলো তখনো তার মুখে। কাছে গিয়ে সে প্রায় ধমকে উঠে বলল, তুমি জানো না মানুষের মুখে টর্চ মারতে হয় না?

সাথে সাথে টর্চের আলো নিভে গেল, ছেলেটা দুর্বল গলায় বলল, এখন তো কারফিউ ভাই।

কারফিউ? কারফিউ কে দিল?

মন্টু ভাই।

সেটা আবার কে?

আমাদের কমান্ডার।

রুমী সাবধানে হাসি গোপন করল। এখন মনে হয় দীর্ঘদিন এরকম চলবে। নিজের এলাকায় এসে সব মুক্তিবাহিনীই নিজেকে কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করে ক্ষমতা দেখানোর একটা রাস্তা খুঁজে বের করবে।

দেশ স্বাধীন করে লাভ কী হল তাহলে? রুমী ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে, মিলিটারিরাও কারফিউ দিত, তোমরাও কারফিউ দাও।

ছেলেটা থতমত খেয়ে বলল, অনেক রাজাকার ছিল। সবকয়টা ধরা পড়ে নাই, তারা যদি ফিরে আসে, তাই—

তারা আর ফিরে আসবে না।

ছেলেটা হঠাৎ অন্তরঙ্গ স্বরে জিজ্ঞেস করল, যান কোথায় আপনি?

পলাশপুর।

সে তো অনেক দূর। চা খাবেন? মোতি মিয়ার দোকান খোলা আছে এখনো।

চল যাই।

মোতি মিয়ার দোকানে ছেলেটির কমান্ডার মন্টু ভাইয়ের সাথে দেখা হল। রুমী যেরকম ভেবেছিল অল্পবয়সের চালিয়াৎ ধরনের একজন মানুষ মোটেও সেরকম না। ত্রিশের মত বয়স মাথার চুলে পাক ধরেছে, একজন সাংসারিক ধরনের লোক। কথা বলে বোঝা গেল লোকটি কাজের মানুষ। মিলিটারি সরে যাবার পর শান্তি-শৃংখলা ধরে রেখেছে। অহেতুক খুন জখম হতে দেয়নি। লুটতরাজ বা নিজেদের শত্রুতার শোধ নেয়ার চেষ্টা করেও এখানে কেউ বেশি সুবিধে করতে পারেনি। ছেলেটি যেন শুনতে না পায় সেভাবে গলা নামিয়ে বলেছিল যে কমবয়সী ছেলেপিলেরা কিছু একটা করার জন্যে একেবারে জান দিয়ে দিচ্ছে, তাদের ব্যস্ত রাখার জন্যে এই কারফিউ এবং পাহারার ব্যবস্থা। মন্টু ভাই এখানে রাত কাটিয়ে ভোরে রওয়ানা দিতে বললেন, রুমী রাজি হল না। এতটা রাস্তা একা যাবে সাথে কেউকে দেবেন কি না জানতে চাইলে রুমী ব্যস্ত হয়ে নিষেধ করল। জোর করে একটা আলাপ চালিয়ে সে একা একা হাঁটার আনন্দটা নষ্ট করতে চায় না। কতদিন পর সে এভাবে একা একা হাঁটছে, নিজের বাড়িতে বাবা মা ভাই বোনের কাছে ফিরে যাচ্ছে।

মসজিদের সামনে টিউবওয়েলটা থেকে পানি নিয়ে রুমী কুলি করল। মুখে সিগারেটের গন্ধটা নষ্ট করার জন্যে সে পান খেয়েছে, কুলি করে পানের চিহ্ন যতটুকু সরানো যায়। নয় মাসের ভেতর ছেলের এতরকম বদ অভ্যাস দেখে বাবা-মা দু'জনেই কষ্ট পেতে পারেন। আঙুল দিয়ে সে চুলগুলো ঠিক করে নেয়, চুলগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে—প্রায় যাত্রা দলের নায়কদের মত অবস্থা, কিন্তু কোন উপায় নেই। বাসার কাছে এসে গেছে সে, সামনের সড়কটা ডান দিকে ঘুরে যাবে, ওপাশের শেষ বাড়িটা তাদের। তাকে এত রাতে হাজির হতে দেখে সবাই কী করবে কে জানে। একটু গরম পানি করে দিতে বলবে, সেটা দিয়ে গোসল করে বাবার একটা পরিষ্কার লুঙ্গি পরে আরাম করে বসবে জলচৌকিটাতে। মা নিশ্চয়ই কিছু একটা রেঁধে ফেলবেন চট করে। সে আরাম করে বসে খাবে। ঝাল মরিচ দিয়ে এক গাদা ভাত খাবার জন্যে বুকটা হা হা করেছে। সবাই তাকে ঘিরে বসে থাকবে, বিলু নিশ্চয়ই এসে বসবে একেবারে তার গা ঘেষে! বাবা হুকোটা ধরাবেন, গুড়ুক গুড়ুক করে দুইটা টান দিয়ে বলবেন, তাহলে পাক-বাহিনীর জল্লাদদের বিচার হবে ঠিক মত? বা এই ধরনের কোন একটা প্রশ্ন।

সড়কটা ঘুরে যেতেই সে সামনে তাকায়। অন্ধকারে পাশাপাশি বাড়িগুলো বোঝা যায় না। শুধু তাদের বাড়িটা আলাদা করে বোঝা যায় বড় দুটি তালগাছের জন্যে। রুমী অবাক হয়ে দেখল তাদের বাসার সামনে একটা আলো নাড়াচাড়া করছে। এখন কম করে হলেও রাত একটা, এত রাতে বাড়ির সামনে কে আলো হাতে হাঁটাহাঁটি করছে? আরেকটু এগিয়ে যায় রুমী। ভাল করে তাকিয়ে দেখে একজন মহিলা, কে বোঝা গেল না এতদূর থেকে। বাড়ির সামনে খানিকটা জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, বাবার খুব বাগানের সখ, শীতের শাকসব্জি লাগিয়েছেন নিশ্চয়ই। রুমী আরেকটু এগিয়ে যায়, মহিলাটি কে? এত রাতে তাদের বাড়ির সামনে কী করছে?

রুমীর পায়ের শব্দ শুনে মহিলাটিও হাতের কুপি বাতিটি তুলে ওর দিকে তাকাল। পাকাচুলের রুগ্ন এক মহিলা, রুমী চিনতে পারে না। রুমী আরো এগিয়ে যায়, মহিলাটিও তার দিকে এগিয়ে আসে, তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করে, কে? কে এটা?

রুমী চমকে ওঠে, অবিকল তার মায়ের কণ্ঠস্বর। ভালো করে তাকাল রুমী আর হঠাৎ তার মাথা ঘুরে উঠল। তার মায়ের এ অবস্থা হয়েছে কেন? একটা বোবা আতংক এসে ভর করছে তার উপর। সে চোখ ঘুরে তাকাতে পারছে না ঘিরে রাখা জায়গাটির দিকে। কেন ও জায়গাটা ঘিরে রেখেছে? কেন? আগর বাতির মিষ্টি সুবাস কেন বাতাসে? রুমী নিঃশ্বাস বন্ধ করে মাথা ঘুরে তাকাল ঘিরে রাখা জায়গাটির দিকে। হ্যাঁ, সে যেটা ভেবেছিল তাই, কুপির আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি দুটি কবর। একটা বড়, একটা ছোট। দুটি আগর বাতি জ্বলছে, সরু সুতার মত ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে উঠে যাচ্ছে উপরে।

রুমীর মাথার ভেতরে হঠাৎ যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, মনে হল মাথাটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না সে, কিছু একটা ধরার চেষ্টা করে।

ওর মা আরেকটু এগিয়ে আসেন, কে? কথা বলে না কেন?

রুমীর খুব কাছে এসে বাতিটা উপরে তুলে মা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তারপর অনেকটা যেন নিজের মনে বললেন, ও। রুমী তুই? এসেছিস? আয়।

বাতিটা নামিয়ে মা আবার হাঁটতে থাকেন, হাতে একটা ঝাটা। উঠোনটা আবার গোড়া থেকে ঝাট দেয়া শুরু করবেন। রাতে তার ঘুম আসে না, কিছু একটা করতে হয় তাই। বিড় বিড় করে কিছু একটা বলছেন, রুমী কিছু শুনতে পায়, কিছু শুনতে পায় না। কিছু বুঝতে পারে, কিছু বুঝতে পারে না।

কই ছিলি তুই? কই ছিলি? গুলি করে বাপ ভাইরে মেরে ফেলল তোর জন্যে, তুই একবার আসতে পারলি না? বিলু বাবা আমার, চিৎকার করে ডাকল, মা গো! মা! আল্লাহরে ডাকে নাই, আমারে ডেকেছে। আমারে? আর আমি কি করেছি? কি! কি করেছি? কিছু করি নাই। দানবগুলোরে বললাম, আল্লাহর কসম লাগে তোদের আমার মাথায় একটা গুলি দে। একটা মাত্র গুলি দে, দানবগুলো দিল না। বিলু বাবা আমার-তার বাপরে ধরে তালগাছের নিচে পড়ে রইল। আহারে কি রক্ত! কী রক্ত রে! আহা! গরু জবাই দিলে এ রক্ত হয় না। আহারে বিলু সোনা আমার, ঘুমা। আমি আছি বাবা তোর কাছে আছি। তোর মাথার কাছে বসে থাকব আমি। তুই ঘুমা, বাবা আমার।

রুমীর মাথার ভেতরে একটা বিস্ফোরণ হল, মনে হল ওর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী ভেঙে চুরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণা! আহ, কি যন্ত্রণা! শূন্যতা! আহ, কি ভয়ানক শূন্যতা! ওর সারা শরীর হঠাৎ হাহাকার করে ওঠে। আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, আস্তে আস্তে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে। কান্নার দমকে ওর শরীর যন্ত্রণাগ্রস্ত পশুর মত কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

ওর মা কাছে এসে বাতিটা তুলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন, মুখে আশ্চর্য একটা ভঙ্গি, যেন কিছু একটা দেখে ভারি অবাক হয়েছেন।

মাঝরাতে বুকভাঙা কান্নার শব্দ কেমন জানি বুক ছিড়ে নিতে চায়। ঘুম ভেঙে চমকে জেগে ওঠে রুনু আর সীমা। কে কাঁদে উঠানে? তারা তো কাঁদে না বহুদিন, ওদের তো সব অনুভূতি শেষ হয়ে গেছে। এখন তো শুধু পাথরের মত বেঁচে থাকা। দুই বোন আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের ভাই যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে। কতদিন থেকে ওরা ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ওরা অবাক হয়ে তাদের ভাইকে দেখে। আর কী, আশ্চর্য! ওদের ভাই কাঁদছে।

শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে দুই বোন তার মাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। আকাশ থেকে তখন কুয়াশা নেমে আসে। পুরুষ মানুষের কান্নার মত লজ্জা আর কী আছে? সে লজ্জা ঢেকে ফেলার জন্যে বুঝি আকাশ থেকে কুয়াশা নেমে এসে তকে আড়াল করে ফেলতে থাকে।

ভালবাসার নক্ষত্র

আজহার ভাই উঠে দাঁড়ালেন, মনে হয় একটা লেকচার ঝাড়বেন। এটা লেকচার ঝাড়ার সময় না আর লেকচার শোনার মত কারো মনের অবস্থাও নেই, কিন্তু তবু মনে হয় তিনি তার লেকচারটা ঝেড়ে দেবেন। কে জানে কতক্ষণ থেকে তিনি মনে মনে এটা ঝালাই করছেন। ফরিদ আজহার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটা হাই তুলল। এই মানুষটির কথাবার্তা হাবভাব এমনি বৈচিত্র্যহীন যে তাকে দেখলে এমনিতেই হাই উঠে যায়। ছোটখাট একটা হাই উঠবে ভেবেছিল কিন্তু ফরিদ অবাক হয়ে দেখল সে বিকট একটা হাই তুলল। হাই তুলতে গিয়ে একবার নাকি কার চোয়াল আটকে গিয়েছিল কিছুতেই আর মুখ বন্ধ হয় না। হাই তোলার সময় মাঝে মাঝেই ফরিদের এই গল্পটা মনে পড়ে, আজো পড়ল। কপাল ভাল তার মুখটা আটকে গেল না হাইটা বের করে দিয়ে সেটা আবার সহি সালামতে বন্ধ হয়ে গেল।

বন্ধুগণ। আজহার ভাই গলা কাঁপিয়ে বললেন, লাল সালাম।

ফরিদ আজহার ভাইয়ের দিকে তাকাল, লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি মনে হয় বেশি নেই। যা ছিল তাও মনে হয় মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংয়ে একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে। তা না হলে অন্ধকার নদীর তীরে মাঝে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খেতে খেতে কেউ কখনো লাল সালাম দেয়? লাল সালাম জিনিসটা কি? সালাম আবার লাল হয় কেমন করে?

বন্ধুগণ, আমাদের দীর্ঘ প্রস্তুতির আজ হবে অগ্নি পরীক্ষা।

লে শালার অগ্নি পরীক্ষা! মাথায় গুলির বাক্স নিয়ে এই যে জলিল খালি পায়ে আঠালো কাদার মাঝে খাম্বার মত দাঁড়িয়ে আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ দেখি অগ্নি পরীক্ষা কথাটার মানে জানে কীনা? একশো টাকা বাজি সে যদি 'পরীক্ষা' কথাটার মানে বলতে পারে, 'অগ্নি' তো ছেড়েই দিলাম। ফরিদের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় জলিল এখনো জানে কী না যে সে কোন্ পক্ষে যুদ্ধ করছে, পাকিস্তানের নাকি স্বাধীন বাংলার।

মনে রেখ কমরেডরা, আমরা মরতে আসি নি—আজহার ভাই হুংকার দিলেন, আমরা মারতে এসেছি। শত্রুর বিষদাঁত ভেঙে দেব চিরদিনের মত।

দাদ ও খুজলির মলম বিক্রি করার সুরে আজহার ভাইয়ের গলা ওঠা নামা করতে থাকে। ফরিদ প্রথম খানিকক্ষণ মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করল কিন্তু লাভ হল না, বক্তব্যটা ঠিক ধরা গেল না। আওয়ামী লীগ দেশের জন্যে কি একটা সাংঘাতিক জিনিস করছে এ ধরনের কথাবার্তা বলে মনে হয়। কিছুক্ষণ শুনে ফরিদ অন্যমনস্ক হয়ে যায় আর ঠিক তার দ্বিতীয়বার হাই উঠল, তার প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটি আবার বিকট একটি হাইয়ে পরিণত হয়ে গেল। কিছু করার নেই, ফরিদ বুঝতে পারে এখন তার একটার পর একটা হাই উঠতে থাকবে। রাত প্রায় দুইটা বাজে, সারাদিন ঘুম নেই, কিন্তু সেজন্যে তার হাই উঠছে না। তার হাই উঠছে কারণ সে একটু একটু ভয় পাচ্ছে। সে যখন একটু একটু ভয় পায় কিন্তু কিছু করতে পারে না তখন তার এরকম একটার পর একটা হাই উঠতে থাকে। পরীক্ষার হলে প্রশ্ন পাবার ঠিক আগে তার এরকম হাই ওঠে, প্রথমবার গোপনে বিলকিসের সাথে দেখা করার জন্যে সে যখন লাইব্রেরির সামনে অপেক্ষা করছিল তার এরকম হাই উঠছিল। বিলকিস! এখন কোথায় আছে কে জানে? মনে হলেই বুকের ভেতর জানি কী রকম করে ওঠে।

ফরিদ বিরক্ত ভঙ্গিতে আজহার ভাইয়ের দিকে তাকাল। লোকটার আক্কেল বলে কিছু নেই, শুধু ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বলে তাকে তাদের গ্রুপ কমান্ডার তৈরি করে দেয়া হয়েছে। লোকটার কী কমান্ডার হবার মত কোন যোগ্যতা আছে? মুক্তিবাহিনীর একজন কমান্ডার কী ঠিক অপারেশানের আগে এরকম ঘ্যান ঘ্যান করে বইয়ের ভাষায় বক্তৃতা শুরু করে? ফরিদ আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আবছা অন্ধকারে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হয় সবকিছু একটা স্বপ্ন এক্ষুণি তার ঘুম ভেঙে যাবে আর দেখবে সে তার পরিচিত বিছানায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে টেবিলে খালি চায়ের কাপ, নিচে সমরেশ বসুর একটা আধখোলা উপন্যাস, জানালা দিয়ে রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছে। কখনো কী সে কল্পনা করেছিল অন্য কিছু নয় শুধু নিজের ঘরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা ঝাঁঝালো উপন্যাস পড়ার মত সহজ ব্যাপারটির জন্যে সে এরকম বুভুক্ষের মত অপেক্ষা করবে? আবার কবে সে করতে পারবে সেটা? পারবে কী কোনদিন? ফরিদ একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ঠিক তখন আজহার ভাইয়ের বক্তৃতা শেষ হল, কারণ ফরিদ শুনল তিনি বিকট সুরে বললেন, 'জয় বাংলা'। বেশি আবেগ দিয়ে বলেছেন বলেই হয়তো সেটা শোনাল 'জেয় বাংলা'।

সবাই সমস্বরে উত্তর দিল 'জয় বাংলা'। ভাগ্যিস আশেপাশে কোন বাড়িঘর নেই, থাকলে এই শ্লোগান শুনে সবার পিলে চমকে উঠত তাতে কোন সন্দেহ নেই। জয় বাংলা শ্লোগানটা এভাবে লেগে যাবে কে জানতো, ভাল শ্লোগানের নিয়ম কানুনের কোনটাই

এখানে ব্যবহার করা হয়নি। শ্লোগান সবসময় হতে হয় দুই অংশ, একজন চিৎকার করে বলে প্রথম অংশ অন্যরা সবাই তখন বলে দ্বিতীয় অংশ। যেরকম পাকিস্তান–জিন্দাবাদ। একজন বলে পাকিস্তান অন্যেরা বলে জিন্দাবাদ। তাছাড়া ভাল শ্লোগানে একটু ছন্দও থাকতে হয়, যেমন 'টিক্কা খানের চামড়া' 'ছিলে নিব আমরা'। জয় বাংলা শ্লোগানে না আছে নিয়ম কানুন না আছে ছন্দ, প্রথম পার্টি বলে 'জয় বাংলা' দ্বিতীয় পার্টিও বলে 'জয় বাংলা'। এটা আবার কেমন ধরনের শ্লোগান? কিন্তু কেমন লেগে গেছে দেখ! পৃথিবীতে আর কী একটি শ্লোগানও আছে যেটি শুধু উচ্চারণ করার জন্যে মানুষকে গুলি করে মারা হয়? না বুঝে উচ্চারণ করলেও? পাঁচ বছরের শিশুকেও? আজ থেকে কুড়ি বছর পর কাউকে এটা বললে সে বিশ্বাস করবে যে পৃথিবীর সবচেয়ে নৃশংস জাতি হচ্ছে পাকিস্তান জাতি, শুধু জয় বাংলা শ্লোগান দেয়ার জন্যে তারা পাঁচ বছরের শিশুকে গুলি করে মারে?

মনে হয় করবে না।

আজহার ভাই নিশ্চয়ই সবাইকে হাঁটতে বলেছেন, অন্যমনস্ক ছিল বলে ঠিক শুনতে পায়নি। সবাই হাঁটতে শুরু করেছে ফরিদও তাদের সাথে হাঁটতে শুরু করে। ঘণ্টা খানেক আগে তাদের স্কাউট রাব্বানী মাস্টারকে পাঠানো হয়েছে। মুখে ছাগল দাড়ি আর চোখে সুরমা দেখে কে সন্দেহ করবে সে মুক্তিবাহিনীর ভেতরের লোক। রাস্তায় কোনরকম সমস্যা দেখলে সে ফিরে এসে তাদের থামাবে। সবকিছু ঠিকঠাক হলে থানা থেকে আধমাইল দূরে স্কুলঘরে তাদের সাথে দেখা করার কথা। অনেক ভেবে-চিন্তে আজকের অপারেশনটা ঠিক করা হয়েছে। তাদের দলে এখন আটজন। এর মাঝে বেশিরভাগই নতুন। ফরিদ নিজে, আজহার ভাই আর লালু নামের গোমড়া মুখের ছেলেটা আগে ছোটখাট অপারেশনে গিয়েছে। অন্যেরা আর কেউ কখনো যায়নি, সবে মাত্র ট্রেনিং শেষ করেছে। যারা নতুন তাদের জন্যেই এই সোজা অপারেশনটি বেছে নেয়া হয়েছে। কলাডিঙি থানায় গোটা ছয়েক রাজাকার আর কিছু স্থানীয় পুলিশ থাকে। খালি হাতে গিয়ে ধমকাধমকি করলেই তারা নাকি জামা-কাপড়ে পেচ্ছাব করে দেয়। নিশি রাতে হঠাৎ করে গিয়ে যদি তাদের কানের কাছে মেশিনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করা হয় তাদের বাপ বাপ বলে পালিয়ে যাবার কথা। তখন থানাটা দখল করে স্বাধীন বাংলার পতাকাটা তুলে দিয়ে সময় থাকতে থাকতে আবার সরে আসতে হবে। যারা নতুন তাদের একটু অভিজ্ঞতা হবে, সাহস বাড়বে পরের বার হয়তো আরো বড় কিছু করতে পারবে। পাশের থানায় নাকি পুরো এক কোম্পানি পাকিস্তানি মিলিটারি এসেছে। খবর পেলে তারা চলে আসতে পারে, তার আগেই সরে পড়ার কথা। এখনো তাদের পেশাদার মিলিটারির সাথে সামনা সামনি যুদ্ধ করার সময় হয় নি। সামনাসামনি যুদ্ধ করার জন্যে দরকার ভাল অস্ত্র। একটা চাইনিজ ভারী মেশিনগান একটা রকেট লঞ্চার আর একটা তিন ইঞ্চি মর্টার থাকলে যুদ্ধের পুরো ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে যায়। থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা যায়, কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধের জন্যে দরকার সত্যিকার অস্ত্র। আট জনের এই দলটাতে রয়েছে মাত্র একটা হালকা মেশিন গান, একটা অটোমেটিক রাইফেল আর একটা স্টেনগান, বাকি সব থ্রি নট থ্রি রাইফেল। যেটুক গোলা গুলি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে টেনে টুনে একঘণ্টার মত চলবে কিনা সন্দেহ। আর অবিশ্যি সহজ অপারেশান, একঘণ্টা দূরে থাকুক মিনিট দশেকও লাগার কথা নয়।

জলিল একটু পিছিয়ে ফরিদের পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। নির্বোধ এই মানুষটিকে কেউই কোনরকম গুরুত্ব দেয় না অথচ সেটা নিয়ে তার কোন রকম দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। ফরিদ পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, কষ্ট হচ্ছে বাই?

শব্দটি বাই নয়, শব্দটি ভাই—ফরিদ শুদ্ধ করে দিতে গিয়েও গেল না। লাইট মেশিন গানটা ঘাড় বদল করে বলল, না।

নাম লাইট, বাংলায় যেটার অর্থ হালকা, কিন্তু জিনিসটা কী ওজন! এটাকে কি ঠাট্টা করে এই নাম দেয়া হয়েছে? মনে হয় না, মিলিটারির লোকজনের রসবোধ খুব তীক্ষ্ণ হওয়ার কথা নয়। কে জানে মিলিটারিরা এত তাগড়া জোয়ান হয়ে যে তাদের কাছে হয়তো এটা হালকাই মনে হয়!

জলিল আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল, আপনাগো তো মাল টানাটানি করে অব্যাস নাই।

শব্দটি অব্যাস না, শব্দটি অভ্যাস। এখানেও ফরিদ শুদ্ধ করে দিল না। বলল, অভ্যাস না থাকলে কী হয়? শরীরের আরেক নাম মহাশয় তাকে যা সহানো যায় তাই সয়।

হা হা হা—জলিল বিকট স্বরে হাসতে থাকে, কিছুতেই আর থামতে পারে না। কথাটি তার এত পছন্দ হয়ে যাবে কে জানত, জানলে ফরিদ বলত না, স্বল্পবুদ্ধির মানুষকে এভাবে উত্তেজিত করা ঠিক না। জলিল অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, বাই, আপনি তো অনেক মজার কথা বলেন। শরীলের নাম মহাশয়—হা হা হা।

শব্দটা শরীল না শব্দটা শরীর। এবারেও ফরিদ শুদ্ধ করে দিল না। একে ঘাটিয়ে কাজ নেই, কিছু একটা বললে সেটা তাকে বোঝাতেই হয়তো আধঘণ্টা পার হয়ে যাবে। ফরিদের কাছে খুব বেশি উৎসাহ না পেয়ে জলিল এবারে পিছিয়ে আরেক জনের সঙ্গে আলাপ জমাল। ফরিদ শুনল সে বলছে, শুনছেন, ফরিদ বাই কী কইছেন শুনেছেন? কইছেন, শরীলের নাম মহাশয়, হা হা হা।

জলিলের মাথার ভেতরে গিয়ে একবার দেখতে পারলে হত সেখানে কী আছে। সম্ভবত চায়ের চামচের দু চামুচ মস্তিষ্ক, এর বেশি হবার কথা নয়। ফরিদের মাঝে মাঝে

ইচ্ছা করে জলিলের মাথায় একটা ঠোকা দিয়ে দেখতে, সে মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে তাহলে ভেতর থেকে একটা ফাঁপা আওয়াজ বের হবে।

হালকা মেশিন গানটা আবার ঘাড় বদল করে ফরিদ আকাশের দিকে তাকাল। ঝকঝকে পরিষ্কার একটা আকাশ, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ যে চারটা তারা চতুর্ভুজের মত সাজানো, ওটার কী নাম কে জানে? খগোল পরিচয় নামে একটা বই দেখেছিল সে, সবকিছু লেখা ছিল সেখানে, কোন নক্ষত্র কোথায় থাকে, কোনটার কী নাম। তখন কোনই কৌতূহল হয় নি। আজকাল দীর্ঘ রাত সে নক্ষত্রদের দেখে, কোন্ কোনটার সাথে তার গোপন ভালবাসার মত রাত হয়ে গেছে। যুদ্ধ যদি শেষ হয় বইটা খুঁজে বের করে তার ভালবাসার নক্ষত্রগুলোর নাম জেনে নিতে হবে।

ফরিদ ভাই।

নবাব সিরাজদ্দৌলা ফরিদের কাছে এসে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

কর।

এই চরিত্রটির নাম সিরাজ। ফরিদ মনে মনে তাকে নবাব সিরাজদ্দৌলা বলে ডাকে। তার কারণ তাদের পুরো দলে এর মত সৌখিন মানুষ আর একটিও নেই, মুক্তিযুদ্ধের চালু ফ্যাসন হচ্ছে চুল দাড়ি গজিয়ে চে গুয়েভারার মত হয়ে যাওয়া। তার মুখেও লম্বা দাড়ি, চুলও এখন প্রায় কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছে। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলার লুঙ্গির গোঁজে একটা কৌটায় রয়েছে একটা কমেট ব্লেড, এক টুকরা সাবান আর শবনমের ছবিওয়ালা ছোট একটি গোল আয়না। যখনই সময় পায় মুখে সাবান ঘষে কমেট ব্লেডটি খালি হাতে ধরে সে দাড়ি কামিয়ে ফেলে। ব্যাপারটি বিস্ময়কর, পুরোনো একটি ব্লেড দিয়ে কড়-কড় শব্দ করে এত তাড়াতাড়ি যে দাড়ি কামিয়ে ফেলা যায় সেটি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হওয়ার কথা না। শুধু যে দাড়ি কামায় তাই না, তারপর দুই হাঁটুতে ছোট আয়নাটা চেপে ধরে সে তার বগল কামানো শুরু করে দেয়। ভয়াবহ ব্যাপার, দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হয়। ফরিদ প্রায় নিশ্চিত যে এই চরিত্রটি তার শরীরের অন্যান্য অংশের রোমরাজিকেও সমপরিমাণ উৎসাহে নিয়মিতভাবে উৎপাটিত করে থাকে, তবে কপাল ভাল সেগুলো আর কাউকে দেখতে হয় না। এই যুদ্ধ শুরু না হলে সে ঘুর্ণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারতো না যে আপাত দর্শনে নেহায়েত একটি সাদামাটা মানুষের কত রকম বিচিত্র অভ্যাস থাকতে পারে!

নবাব সিরাজউদ্দৌলা গলা নামিয়ে বলল, আপনি কি নিজের চোখে কখনো সিনেমার নায়িকা দেখেছেন?

নায়িকা?

হ্যাঁ। শবনম, সুচন্দা, না হয় কবরী?'

না, দেখি নাই। কেন?

আমাদের গ্রামের একজন দেখেছে। সে বলেছে সিনেমার মাঝে দেখতে তাদের যত সুন্দর লাগে আসলে নাকি তারা তত সুন্দর না। গায়ের রং নাকি শ্যামলা।

তাই নাকি?

হুঁ। সেইটা কেমন করে হয় ফরিদ ভাই? সেইটা কী হতে পারে?

ফরিদ নবাব সিরাজদ্দৌলার সাথে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ করার চেষ্টা করে আবিষ্কার করল, নবাব সিরাজদ্দৌলার তুলনায় চিত্র জগৎ সম্পর্কে তার জ্ঞান একেবারেই সীমিত। নবাব সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে চায়ের দোকানে বসে চিত্রালী গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে আসছে। চিত্র তারকাদের সম্পর্কে সে যেটুকু জানে চিত্র তারকারা নিজেরাও তাদের সম্পর্কে ততটুকু জানে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ করায় নবাব সিরাজদ্দৌলার ব্যক্তিগত আগ্রহ রয়েছে, সে আবার চায়ের দোকানে বসে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তিতে প্রতি সপ্তাহে চিত্রালী পড়া শুরু করতে চায়।

আগুন আছে কার কাছে? সালাম ভাই মুখে একটা সিগারেট চেপে ধরে দল থেকে বের হয়ে দাঁড়ালেন।

আমার কাছে আছে। ফরিদ পকেট থেকে ম্যাচটা বের করে দিল। সালাম ভাইয়ের সিগারেট খাওয়া দেখে তারও সিগারেট ধরানোর ইচ্ছে হল, পকেট হাতড়ে প্যাকেটটি বের করছিল, সালাম ভাই তাকে থামিয়ে নিজের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দিলেন। সিগারেট এখন দুষ্প্রাপ্য জিনিস সবাই নিজের সঞ্চয় যক্ষের ধনের মত আগলে রাখে সালাম ভাই ছাড়া। লোকটি অসাধারণ, বলা যায় তাদের দলের একমাত্র খাঁটি ভদ্রলোক। তাদের সবার মাঝে সম্ভবত তার বয়স সবচেয়ে বেশি, বিয়ে করেছেন, দুইটা ছোট ছোট বাচ্চাও রয়েছে। কালীগঞ্জ বাজারের ছোট মনিহারী দোকান ছিল, যে মাসের গোড়ার দিকে মিলিটারির আগুনে পুরো বাজারের সাথে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তখন বউ বাচ্চাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে যুদ্ধে চলে এসেছেন। সালাম ভাই ফরিদকে সিগারেট দিচ্ছেন দেখে শাহজাহান এগিয়ে এসে হাত বের করে দিল। শাহজাহানের নামটি মোগল বাদশাহের হলেও তার স্বভাব চরিত্র ছোটলোকের। ফরিদ লক্ষ করে দেখেছে শাহজাহানের কড়ে আঙুলটি ছোট। কিরোর হাত দেখার বইয়ে পড়েছিল, কারো হাতের কড়ে আঙুল ছোট হলে সে পকেটমার হয়।

সালাম ভাই সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, একটু জিরাতে পারলে হতো। মাজা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে।

ফরিদ বলল, আজহার ভাইকে বলি?

না থাক। সালাম ভাই নির্মমভাবে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, ইস্কুল তো এসেই যাচ্ছে, তখন জিরাবো। একটু থেমে যোগ করল, শালার উকুনের জ্বালায় আর পারি না।

ফরিদ হেসে বলল, কেন গালি দিচ্ছেন সালাম ভাই, কালকেই আপনাকে ফার্স্ট প্রাইজ জোগাড় করে দিল।

সালাম ভাই উচ্চস্বরে হেসে উঠল, চাপা গুমোট ভাবটা কেটে হঠাৎ করে পরিবেশটা তরল হয়ে যায়।

দলে সবার মাথায় উকুন হয়েছে। ফরিদ প্রথমবার যখন চিরুনীতে একটা নধর উকুন আবিষ্কার করেছিল তার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। লজ্জার এই ব্যাপারটি সে গোপন রাখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু দেখা গেল অন্যেরা উকুনের ব্যাপারটি বেশ স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে। সালাম ভাই রসিক ব্যক্তি, তিনি উকুন দিয়ে একটা খেলা আবিষ্কার করে ফেললেন। প্রথমে সবাই গোল হয়ে বসে নিজের মাথা আঁচড়ে উকুন বের করে, অবিশ্বাস্য ব্যাপার প্রথমবার ফরিদের মাথা থেকে মোট চৌদ্দটি নানা আকারের উকুন বের হয়েছিল। তারপর সবাই বেছে সবচেয়ে পুরুষ্ট উকুনটি নিয়ে সালাম ভাইয়ের কাছে আসে। সালাম ভাই তখন কাগজে একটি গোল বৃত্ত আঁকেন। সেটার নাম দেয়া হয় উকুন স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামের মাঝে তিনি সবগুলো উকুন ছেড়ে দেন। যার উকুন সবচেয়ে প্রথম বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। খেলাটি দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে কারণ অন্যান্য গ্রুপেও সেটি খেলা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। কিছুদিনের ভেতরে বিভিন্ন মুক্তিবাহিনীর দলের ভেতর একটা টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। আজহার ভাই আগে এইসব ছেলেমানুষী ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেন। ইদানিং তিনিও খেলায় যোগ দিচ্ছেন এবং অন্যদের মত চিৎকার করে নিজের উকুনকে উৎসাহ দিচ্ছেন। জয়নালের সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস, সেদিন তার উকুন বিজয়ী হওয়ার পর কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে উকুনটিকে আবার নিজের চুলের মাঝে ছেড়ে দিয়েছিল।

আজহার ভাই সবাইকে থামতে বললেন। সামনে স্কুলের দোচালা ঘরটা দেখা যাচ্ছে। ভেতরে রাব্বানী মাস্টার থাকার কথা। তিনি এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় ডাকলেন, রাব্বানী মাস্টার?

কোন উত্তর শোনা গেল না। অভ্যাস বশত সবাই একটু পিছিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়।

রাব্বানী মাস্টার? আজহার ভাই আবার ডাকলেন, আমি আজহার।

তখন সন্তর্পণে কয়েকজন বের হয়ে আসে। কাছে এলে দেখা গেল রাব্বানী মাস্টার আর তার সাথে আরো দুজন স্থানীয় লোক।

আজহার ভাই ওদের দিকে ঘুরে বললেন, সবাই বিশ্রাম নাও দশ মিনিট। সাথে সাথে যে যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল। শরীর এক আশ্চর্য জিনিস, প্রয়োজনে তাকে যা খুশি করিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু বিশ্রামের লোভ দেখালে চোখের পলকে সেটা লুফে নেয়।

থানাটি ঘিরে ওরা আটজন নিঃশব্দে পজিশন নিয়েছে। বেশিরভাগ জায়গায় থানার আশেপাশে সব গাছপালা কেটেকুটে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। এখানে শুধু গোটা ছয়েক রাজাকার, পাকিস্তানি মিলিটারিরা এখনো আসেনি, এলে নিশ্চয়ই এর চেহারা পাল্টে যাবে। তখন দু-এক মাইলের ভেতরে পজিশন নেয়ার জায়গা থাকবে না।

ফরিদ সড়কটার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। হালকা মেশিন গানটা রাখার জন্যে একটা সমতল জায়গা দরকার, কিন্তু সেরকম ভাল জায়গা পাওয়া গেল না। একবার গুলি করা শুরু হলে এটাকে চেপে ধরে রাখতে গিয়ে মনে হয় দম বের হয়ে যাবে। গুলির বেল্ট নিয়ে থাকবে জলিল। ফরিদের কপাল! সবচেয়ে নির্বোধ মানুষটিই সবসময় তার সঙ্গী। কিছু করার নেই, এই নির্বোধ মানুষটিকে মাথায় করে গুলির বাক্স টেনে আনা কিংবা মেশিন গানের গুলির বেল্ট ধরে রাখা এই ধরনের কাজ ছাড়া আর অন্য কোন রকম দায়িত্ব দেয়া যায় না। চেষ্টা করে দেখা হয়েছে, লাভ হয়নি।

ফরিদের ডান দিকে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ ফুট দূরে থাকলেন আজহার ভাই, তার সাথে নবাব সিরাজদ্দৌলা। তাদের ডান দিকে সমান দূরত্বে শাহজাহান, তার সাথে লালু। আরো ডান দিকে সালাম ভাই আর জয়নাল। যতটুকু সম্ভব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিন্তু মোটামুটি কাছাকাছি যেন প্রয়োজনে চিৎকার করে কথাবার্তা বলা যায়।

আজহার ভাই প্রথমে একটা গ্রেনেড ছুঁড়বেন, এখান থেকে সেটা থানা পর্যন্ত যাবে না কিন্তু বিস্ফোরণের একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে সেটা দিয়েই শুরু হবে, সবাই তখন গুলি করা শুরু করবে। গুলি বেশি নেই, বাজে খরচ করা যাবে না, কিন্তু প্রথম কয়েক মিনিট তবুও তুমুল গুলি বর্ষণ করার কথা। একসাথে সবাই না করে, তাল রেখে একজনের পরে আরেকজন, ভেতরে যারা আছে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে যেন ভয়ে কাপড় জামা নষ্ট করে ফেলে। পিছন দিয়ে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়েছে, পাল্টা গোলাগুলি না করে পালিয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি, তখন থানায় ঢুকে পড়া যাবে। তাদের কিছু গ্রেনেডও আছে, একেবারে কাছাকাছি যেতে পারলে সেগুলো ব্যবহার করা যাবে তবে খুব সাবধানে, নিজেদের গ্রেনেডে নিজেদের আঘাত পাওয়া অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে কিছুদিন আগে।

ফরিদ নিঃশব্দে হালকা মেশিন গানটা ধরে শুয়ে থাকে। পেটের ভেতরে কেমন

জানি পাক খাচ্ছে, প্রত্যেকবার অপারেশানের আগে আগে তার পেটের ভেতর এরকম অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হতে থাকে। আকাশের দিকে তাকাল ফরিদ, মেঘ এসে তার প্রিয় নক্ষত্রগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে, কে জানে বৃষ্টি হবে কী না।

জলিল ফিস-ফিস করে বলল, বাই।

কী হল?

কেমুন একটা গন্ধ আসে না?

ফরিদ নাক টেনে একটা নিঃশ্বাস নিল। সত্যিই কেমন জানি একটা বাজে দুর্গন্ধ আসছে। বলল, হুঁ।

মনে হয় কোন হারামজাদা হেগে রেখেছে ধারে কাছে। কী বলেন?

নিশি রাতে একটি খণ্ড যুদ্ধ শুরু করার পূর্বমুহূর্তে আলাপ করার জন্যে এই নির্বোধ মানুষটি কি এর থেকে ভাল একটি বিষয় খুঁজে বের করতে পারত না?

ঠিক এই সময় বিকট আওয়াজ করে গ্রেনেডের বিস্ফোরণ হল। রোগাপটকা আজহার ভাই গ্রেনেডটি ভালই ছুঁড়েছেন বলতে হবে। জলিল বলল, বিসমিল্লা, ফরিদ ভাই।

ফরিদ তার ট্রিগার টেনে ধরল। প্রচণ্ড আওয়াজ করে তার হালকা মেশিনগানটি থেকে ঝলকে ঝলকে গুলি বের হতে থাকে, বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধ আর কানে তালা লাগানো শব্দে মুহূর্তে সাদামাটা এই গ্রাম্য অঞ্চলটি একটি নিষ্ঠুর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়।

সাথে সাথেই থানার ভেতর থেকে মানুষজনের গলায় আওয়াজ শোনা গেল। চিৎকার চেঁচামেচি হৈ চৈ শুরু হয়েছে, এরকমই হওয়ার কথা কিন্তু ফরিদ তবু একটু অবাক হল। ভেতরে ছয় সাতজনের বেশি মানুষ থাকার কথা নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে অনেক মানুষ। তাছাড়া যে জিনিসটি তাকে বেশি অস্বস্তির মাঝে ফেলে দিচ্ছে সেটি হল ভেতরে মানুষজন যেন বিজাতীয় ভাষায় কথা বলছে। পাকিস্তানি মিলিটারিরা ঘাঁটি করে ফেলে নি তো? ফরিদ ট্রিগারটি ছেড়ে শোনার চেষ্টা করল আর কি আশ্চর্য, সত্যিই শুনতে পেল পাকিস্তানি সৈন্যরা উচ্চস্বরে চিৎকার করে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে। কী সর্বনাশ!

মাই গুডনেস! বেশি ভয় পেলে ফরিদ মাঝে মাঝে ইংরেজিতে একটা দুইটা কথা বলে ফেলে।

জলিল জিজ্ঞেস করল, কী হইছে বাই?

পাকিস্তানি মিলিটারি।

তয়?

তয়, কী কোন বাংলা শব্দ আছে? কিন্তু সেটা নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর সময়

নেই, আবছা অন্ধকারে থানার ভেতরে হঠাৎ হঠাৎ কাউকে ছুটে যেতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটাকে গুলি করে ফেলে দিতে পারলে হতো। ফরিদ মেশিন গানটা ঘুরিয়ে আবার গুলি করতে থাকে। মারতে কী পারবে কোন শুয়োরের বাচ্চাকে? গুলি করে কি চূর্ণ করে দিতে পারবে কোন শালার মাথা? ঘিলু কি ছিটকে বের করে ফেলে দিতে পারবে? শেষ করে দিতে পারবে হারামজাদার গুষ্টিকে? পারবে কী? চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে ফরিদের, বিজাতীয় একটা আক্রোশ এসে ভর করে ওর উপর। পাগলের মত গুলি করতে থাকে। গুলির প্রচণ্ড শব্দ যেন আগুন ধরিয়ে দেয় স্নায়ুর ভেতরে। মার হারামজাদাদের—মার!

বাই। জলিল আবার ডাকল।

কী হল?

মরছে কী একটা দুইটা?

জানি না।

মারেন বাই মারেন। খাঁটি পাঞ্জাবি শালাদের ছাইড়েন না।

ঠিক আছে।

কী কপাল আমাগো, খাঁটি পাঞ্জাবি পাইয়া গেলাম। জলিল অন্ধকারে দাঁত বের করে হাসল।

নির্বোধ হওয়ার অনেক সুবিধে। মোটামুটি একটা বিপর্যয়কেও মাথামোটা মানুষটি ভাবছে একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। কিছু ছেলেমানুষী অস্ত্র নিয়ে ভুল করে এক কোম্পানি পেশাদার মিলিটারিকে আক্রমণ করে ফেলাটা আর যাই হোক ভাল কপালের লক্ষণ হতে পারে না। এখান থেকে সময়মত সবাই মিলে জান নিয়ে সরে যেতে পারলে বুঝতে হবে তাদের উপর মা-বাপের দোয়া রয়েছে। তার সম্ভবনা কম। একমাত্র ভরসার কথা যে যে শালারা জানে না তারা ভুল করে আক্রমণ করে ফেলেছে, নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে জেনে শুনেই এসেছে, সঙ্গে আছে অনেক লোকজন অনেক রকম অস্ত্রপাতি। তবে পেশাদার মিলিটারি, বেশিক্ষণ ধোকা দিয়ে রাখা যাবে না, একটু পরে ঠিকই বুঝে ফেলবে। তাড়াতাড়ি কিছু একটা ঠিক করতে হবে। আজহার ভাই কী করবেন ঠিক করেছেন কী? মানুষটা কথাবার্তা বলতে পছন্দ করে, কিন্তু বিপদের সময় ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কী?

ফরিদ আবার গুলি করতে থাকে। কোথায় পজিশন নেবে হারামজাদারা?

কোথা থেকে গুলি করবে? কতজন আছে কে জানে। না জানি কি রকম অস্ত্র আছে সাথে, ভাল হওয়ারই কথা। হেভি মেশিন গান কী আছে? রকেট লাঞ্চার? যাই থাকুক একটানা গুলি করে যেতে হবে, শালারা যেন ভাল পজিশন নিতে না পারে। একবার ঠিক করে পজিশন নিয়ে নিলেই সমস্যা, তখন পালানো ছাড়া উপায় নেই।

ওপাশ থেকে প্রথমে গুলি হল ছাড়া ছাড়া ভাবে। এলোপাথাড়ি গুলি, মনে হচ্ছে রাইফেল। তারপর অটোমেটিক রাইফেলের শব্দ শুনতে পেল। সবশেষে ভারী মেশিন গান, ফরিদ শব্দটা চিনতে পারলো, চাইনিজ মেশিন গান! কতদিন থেকে ওরা জোগাড় করার চেষ্টা করছে। কি চমৎকার জিনিস! শালারা গুছিয়ে নিয়েছে কত তাড়াতাড়ি। ফরিদের হিংসে হল, তিন মাসের ট্রেনিং নিয়ে একটা রাইফেল হাতে বের হয়ে আসা এক কথা, আর দিনের পর দিন বছরের পর বছর মানুষ মারা শেখা অন্য কথা। মনে হচ্ছে বেশিক্ষণ আর এখানে থাকা যাবে না। আজহার ভাইয়ের সাথে একবার কথা বলতে পারলে হতো। ফরিদ গুলি করা থামিয়ে ডাকল, আজহার ভাই।

আজহার ভাই শুনতে পেলেন না। দুপক্ষের গুলির শব্দে এখন কানে তালা লাগার অবস্থা। ফরিদ আবার গলা উঁচিয়ে ডাকল, আজহার ভাই—

কী হল?

কী করবেন এখন?

আজহার ভাই শুনতে পেলেন না, বললেন, কী বল?

ফরিদ আবার চিৎকার করে বলল, কী করবেন এখন?

আর ঠিক তখন ব্যাপারটি ঘটল।

গুলির আঘাত প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক বলে যে ধারণা রয়েছে সেটি সত্যি নয়। তবে সেটি শক্তিশালী, একটি ছোট বুলেটে যে এত শক্তি থাকতে পারে সেটি ফরিদের ধারণা ছিল না। প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়ে গিয়েও বুঝতে পারে না কি হয়েছে? তার কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝতে। যখন বুঝতে পারল সে গুলি খেয়েছে প্রচণ্ড আতংকে সে উঠে বসার চেষ্টা করল আর হঠাৎ করে আবিষ্কার করল সে উঠতে পারছে না। প্রথম বার মৃত্যুভয় পেল সে, ভয়ংকর সেই ভয়। যন্ত্রণাটি এল একটু পরে। প্রথমে এল সূক্ষ্ম একটু যন্ত্রণা হিসেবে, ভোতা একটু যন্ত্রণা, বোঝা যায় না এরকম। তারপর সেটি বাড়তে শুরু করল। কিছু বোঝার আগে হঠাৎ অমানুষিক একটা যন্ত্রণা তার পুরো অনুভূতিকে গ্রাস করে নেয়। আকাশের দিকে মুখ করে সে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। পৃথিবী থেকে কে যেন সমস্ত বাতাস শুষে নিয়েছে। আহ খোদা! তুমি কী করলে এটা? কী করলে?

জ্ঞান হারানোর আগে সে দেখতে পায় জলিল তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ডাকছে, ফরিদ বাই বাই, ও বাই। আল্লাহর কসম ফরিদ বাই—আল্লাহর কসম—

জলিলের আর্ত চিৎকার, গুলির প্রচণ্ড শব্দ সবকিছু ধীরে ধরে মিলিয়ে যাচ্ছে, প্রাণপণে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করে ফরিদ, কিন্তু সবকিছু ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায় তার সামনে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেই চেতনা হারালো ফরিদ।

ফরিদের মনে হল সে প্রায় একযুগ পরে চোখ খুলে তাকাল। এত অন্ধকার কেন চারদিকে? কোথায় সে? কিসের এত শব্দ চারিদিকে? হঠাৎ করে দুঃস্বপ্নের মত সব মনে পড়ে গেল। চমকে উঠে বসার চেষ্টা করল সে সাথে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সারা শরীর কেঁপে উঠে তার। চেতনা হারিয়ে যাচ্ছিল তার, অনেক কষ্টে আবার অবচেতনার অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনল নিজেকে। মুখের উপর ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সারা শরীর শিউরে উঠছে তার। একটু উষ্ণতা কী পাওয়া যায় না কোথাও? কেউ কী আছে আশেপাশে? মাথা ঘুরে তাকাল চারদিকে। না কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। সবাই চলে গেছে? সবাই? তাকে ফেলে?

এক আশ্চর্য শূন্যতা গ্রাস করল তাকে। এই তাহলে শেষ? নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে আর সে কখনো আকাশের দিকে তাকাবে না। বিলকিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কোনদিন সে তার ঠোঁট স্পর্শ করবে না? কোনদিন না? ঠিক জানে না কার উপর কিন্তু এক প্রচণ্ড অভিমানে তার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে। বুক ভেঙে যায় এক অসহনীয় দুঃখে। আস্তে আস্তে সে ডাকল, মা, মাগো—

গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল, কিন্তু কেউ তার ডাকের উত্তর দিল না।

ফরিদ আবার তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অন্ধকারে।

ফরিদ দেখল ওর মা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। ফিসফিস করে বললেন, খোকা তোকে বলেছিলাম না তুই যাসনে, তুই কেন গেলি? কেন গেলি?

মা তুমি বুঝবে না মা। তুমি বুঝবে না।

কেন গেলি তুই? কেন গেলি? বাবা আয় আমার বুকে আয়। আয়। মা হাত তুলে ওর দিকে এগিয়ে এলেন।

না না মা, তুমি যাও, ফরিদ চিৎকার করে বলল, তুমি যাও। তোমার কাপড়ে রক্ত লেগে যাবে, কত রক্ত দেখ। তুমি যাও।

আয় বাবা একবার আয় আমার কোলে আয়। একবার আয়। মাত্র একবার।

না না না। যাও মা, যাও। মিলিটারি এসে যাবে মা ভোর হলেই মিলিটারি আসবে, খুঁজে খুঁজে বের করবে আমাকে মা। তুমি যাও।

বাবা তুই কেন গেলি? কেন গেলি?

মিলিটারি এসে আমাকে গুলি করে মারবে এখন, তুমি যাও, তুমি সেটা দেখ না।

বাবা আমার সোনা আমার ধন আমার তুই কেন গেলি বাবা আমায় ছেড়ে। কেন গেলি?

তুমি বুঝবে না মা, তুমি বুঝবে না। যেতে হয়।

কেন যেতে হয়? কেন যেতে হয়? কেন? ফরিদ কথা বল। ফরিদ। ফরিদ ফরিদ—

ফরিদ আবার চোখ খুলে তাকায়। কে ডাকছে তাকে?

ও ফরিদ। ফরিদ বাই।

সত্যিই কেউ ডাকছে তাকে। কে? এটা কি স্বপ্ন? না কী সত্যি? কে ডাকছে? তার মাথার কাছে বসে আছে কে?

জলিল! আজহার ভাই! পিছনে কে? গুলি মেরে এগিয়ে আসছে ওরা কারা? শাহজাহান? সিরাজ? লাল্টু? তাকে নিয়ে যেতে এসেছে? সত্যি তাকে নিয়ে যাবে?

গুলির শব্দ হচ্ছে, কি প্রচণ্ড গুলি বৃষ্টির মত গুলি হচ্ছে, লক্ষ কাল বোশেখী যেন একসাথে নেমে এসেছে ওদের মাথার উপর। আহ! কি শব্দ! এত শব্দ কেন! সব শব্দ ঝাপসা হয়ে যায় তারপর আবার নদীর স্রোতের মত চেতনা ফিরে আসে তারপর আবার মিলিয়ে যায়। তার মাঝে আবার সে কথা শুনতে পারে, আজহার ভাই বলেছেন, না জলিল তুমি পারবে না।

পারুম বাই। আপনি আমারে দেন।

তুমি পারবে না।

পারুম বাই। বাংকার থাইকা হেভী মেশিন গান চালাইছে বাই, কুনোদিন ফরিদ বাইরে লইয়া যাইতে পারবেন না। আমারে দেন দুইটা গ্রেনেড একবারে কাছে গিয়া ভেতরে ফালাইয়া দিই। মিশিন গানটা বন্ধ কইরা আসি।

পাগল! তুমি মরবে!

না বাই এই সময়ে অফয়া কথা কইলেন না। থু থু থু। আমি মরমু না। পীর সাহেবের তাবিজ আছে আমার গলায়। এই দেহেন। দেন বাই দুইটা গ্রেনেড। পিনটা টাইনা বার করবার কতক্ষণ পরে যেন ফুটে?

আকাশ থেকে যেন বজ্র নেমে আসে পৃথিবীতে। ধ্বংস করে দেবে সৃষ্টি জগৎ। তার মাঝে সরীসৃপের মত গুড়ি মেরে জলিল এগিয়ে যায় দুটি গ্রেনেড নিয়ে। পাথরের মত মুখ করে অন্যেরা বসে আছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে। বিস্ফোরণের শব্দের সাথে সাথে প্রচণ্ড গুলির বন্যায় ভাসিয়ে দিবে চারদিক, তার মাঝে টেনে সরিয়ে নেবে ফরিদকে, রাব্বানী মাষ্টার গ্রামের লোকজন নিয়ে বসে আছে অদূরে। ফরিদকে নিয়ে ছুটে যেতে হবে ডাক্তারের কাছে, খবর চলে গেছে ডাক্তারের কাছে, চার গ্রামে একজন মাত্র ডাক্তার, কিন্তু তাতে কী? ঘুম ভেঙ্গে উঠে এসেছে চার গ্রামের লোক, তারা কি এক নজর দেখতে পারবে বিদ্যুতের ঝলক এই তরুণদের? যারা পিশাচের জিব ছিড়ে আনে খালি হাতে?

আকাশে মেঘ কেটে আবার নক্ষত্র দেখা দিয়েছে? ঐতো ভালবাসার নক্ষত্র ফরিদের দিকে তাকিয়ে আছে জ্বল-জ্বল করে নিঃসঙ্গ নক্ষত্র, ভাল করে তাকিয়ে দেখ। আমি যদি না থাকি তোমায় পৃথিবীকে বলতে হবে এর ইতিহাস।

ছাই, চোখে পানি আসে কেন?

ঝাপসা হয়ে আসে ভালবাসার নক্ষত্র, কিন্তু ফরিদ জানে বিস্ময়াভিভূত এই নক্ষত্র মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।